ফেলে। উমা ভাবিতে লাগিল, কি পুণ্য করিলে, এ রকম স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজের স্বামীর ঘরে যাওয়া যায়।

নির্জ্জন শয়ন-কক্ষে ঊষার স্বামী 'সোফা'য় বসিয়াছিল; ঊষা প্রবেশ করিতেই বলিয়া উঠিল, "তবু ভাস যে, হুজুরের দয়া হয়েছে! কে আসবে বলে এতক্ষণ ধরে বারাণ্ডায় বসে থাকা হয়েছিল? এত রকম বার থাকতে রবিবারটাই পছন্দ হোল? এ কেবল ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করা, না ঊষা? ক্ষমতা যখন হাতে আছে, তখন তার ব্যবহারই বা না করবে কেন বল?" ঊষা বলিল, "সবাই যদি সেটা বুঝে চলত, তা হোলে সংসারে অনেক দুঃখ-কষ্ট অশান্তি কমে যেত।"

ঊষার হাস্যাননে একবার যেন মেঘের ছায়া পড়িল; কিন্তু পরক্ষণেই সে হাসিয়া বলিল, "সে-দিন যার কথা বলেছিলুম,—সেই গৌরী। দেখ না, কোলে নিতে ইচ্ছে করে না?" ঊষার স্বামী হাত পাতিল। গৌরী উচ্চ স্বরে হাসিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঊষা স্বামীর পাশে বসিয়া বলিল, "কি রকম নিষ্ঠুর এর বাপ, বল দেখি? কি করে এমন গোলাপ-মুকুলটি ছেড়ে আছে? চোখে দেখে নি তাই! দেখ্‌লে বোধ হয়, ছাড়্‌তে পারত না।"

ঊষা নিঃশ্বাস ফেলিল, ঊষার স্বামীও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। হাস্যময়ী ঊষা আবার হাসিয়া বলিল, "গৌরীকে কিন্তু আর আমি দিচ্চি না। ওর মার কাছে আমি চেয়ে নিয়েচি; ও আমারই মেয়ে।" ঊষার স্বামী ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বটে! পিতৃসম্পর্কে, না, মাতৃসম্পর্কে?" ঊষা ঠাট্টাটা গায়ে মাখিল না, উল্টিয়া জবাব দিল, "যা বল।" ঊষার স্বামী বলিল, "পাগলের মতো, কি যে বল! ঠাট্টাটাও বুঝ্‌লে না, ঊষা?"

এইবার ঊষা বিষণ্ণমুখে বলিল, "ঠাট্টার হ'লে ঠাট্টা বল্‌তুম। আর যদি সত্যি হয়?" ঊষার স্বামী চমকিত ভাবে ঊষার দিকে চাহিল,—ঊষা কি বলিতে চায়? ঊষা আবার বলিল, "কেন? দেখ দেখি, এর কোন্‌খানটা অমিল আছে, বল দেখি? মুখ, চুল, রং, গড়ন, সব দেখ। নিজের মেয়েকে কি নিজে চিন্‌তে পার না? চম্‌কে উঠো না। আমি যখন তোমার মুখে সব শুনেছিলুম, তখন তোমার কথায় তাকেই দোষী ভেবেছিলুম। তখন তো জানি না, তুমি সত্যিকার দেবী ভাসিয়ে দিয়েছ। প্রতিমার প্রাণ আছে কি না, দেখ নি; রঙের চক্‌চকানি ছিল না বলে, তোমার মনে ধরে নি। তুমি স্বামী, আমার দেবতা। তোমাকে ছোট করে দেখ্‌তে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি দোষ করতে চাইলেও আমি তোমারে করতে দোষ না।" স্বামীকে উত্তরের অবকাশ না দিয়া ঊষা বাহির হইয়া গেল। বিস্মিত স্তম্ভিত সুরেশ কন্যাকে কোলে লইয়া তেমনই বসিয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই আলো ও ছায়া, ঊষা ও উমা দুইজনে আসিয়া সুরেশকে প্রণাম করিল। দুইজনেরই চোখে জল।

সুরেশ তখনও নির্ব্বাক্‌ই রহিয়াছে দেখিয়া, তাহার লজ্জা ভাঙিবার জন্য ঊষা বলিল, "বেশ লোক তো তুমি! আমরা প্রণাম করলুম, একটা আশীর্ব্বাদও করলে না? (উমার প্রতি) দিদি, তখনই তো বলেছিলুম, এ সব আমার

নয়। তোমারই সব দিদি! তুমি আপনার ঘরকন্না বুঝে নাও, আমায় তোমাদের পায়ের পাশে ফেলে রেখে দিও। আমি শুধু আমার গৌরী-মাকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াব।"

অপরাধী সুরেশ তখনও কথা কহিতে পারিল না; শুধু সজলনেত্রে কন্যাকে চুম্বন করিল।

কম্পিতহৃদয়া, বিস্মিতা উমা বলিয়া উঠিল, "উষা, তুই কি ভাই, বিধাতার উল্টা সৃষ্টি! পথের কাঁটা সতীনকে আবার কে কোথায় কুড়িয়ে ঘরে নিয়ে আসে, ভাই?" উমা কাঁদিয়া ফেলিল।

উষা জলভরা চোখে একমুখ হাসিয়া বলিল, "ও দিদি, তা বলে যেন এ পথের কাঁটাটাকে দূর করে দিয়ো না। উল্টাসৃষ্টি কি আমি একাই ভাই! স্বামী অন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করচেন, জেনেও যে স্ত্রী তাঁর দোষ দেখতে পায় না, সতীনের সুখেই সুখ মনে করে, সে কি উল্টাসৃষ্টি নয়? আর আমাদের স্বামী? রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্! তাঁর এ চন্দ্রে কলঙ্ক কেন দিদি? গুণের আদর তিনিও কি বুঝে লেন না? এও কি বিধাতার বোঝা সৃষ্টি বলবে?"

এতক্ষণে সুরেশ কথা কহিল, "মাপ কর আমায়; দু'জনেই মাপ কর। সত্যি এবার গৌরীকে ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হবে। আমি তা পারব না। আজ বুঝ্‌লুম সত্যই, তোমরা দেবী; এ মহাপাপীই বিধাতার উল্টো সৃষ্টি! গৌরী আমায় বুঝিয়েছে।"

সজলনেত্রে পতি ও সপত্নীর চোখের জল মুছাইয়া উষা বলিল, "আর গৌরী আমাদের সোনার সৃষ্টি, তিন জনেরই সোনার বাঁধন!"

শ্রীলতিকা দেবী।

আয় ফিরে আয়।*

১

কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!
দুঃখিনী জননী তোর
কেঁদে নিশি করে ভোর,
ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখি যামিনী কাটায়।
তুই যে বুকের ধন,
তোর মত কোন্ জন?
ওরে মরি, তোরে বাছা, রাখিব কোথায়!
সহস্র আপদে হায়,
লোলুপ কটাক্ষে চায়,
পিষিতে বুকের রক্ত ছুটিয়া বেড়ায়!
আমি যাদু চাহি তোকে
লুকায়ে রাখিতে বুকে,
রাক্ষসে পিশাচে যেন দেখিতে না পায়।
কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!

২

থাকি চেয়ে তোর মুখ কত যে আশায়!
তুই মাতৃভক্ত ছেলে,
কি করে রে মাকে ফেলে
গেলি চলে কোন্ দেশে? কি কাজ তথায়?
আছে তোর ভাই যত,
ঈর্ষা-দ্বেষে সবে রত
চরণে দলিছে সদা অভাগিনী মায়

* কোনও নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুর উদ্দেশে লিখিত।

বুঝে না মায়ের ব্যথা,
বুঝে না নিজের কথা,
আপনি কুঠার হানে আপনার পায়!
নিজ প্রাণ তুচ্ছ ক'রে
তুমি যে তা'দের তরে
নিয়ত খেটেছ কত, বলা নাহি যায়।
আজ কেন গেলি ফেলে? আয় চলে আয়!

৩

কোথা গেলি? কেন গেলি? আয় ফিরে আয়!
কোন গিরি-গুহা-মূলে,
কাননে নদীর কূলে
নগরে প্রান্তরে কিবা আছিস কোথায়?
এখনো হয় নি সারা,
কি কাজ এমন খারা?
কার ধ্যানে মগ্ন চিত্ত কোন্ তপস্যায়?
সাধনা কি সিদ্ধ হবে?
অনন্ত মহিমা রবে
অটুট অক্ষয় হয়ে এ মর ধরায়?

৪

ডাকিছে জননী, "ঘরে আয় ফিরে আয়!
তুই যে কোলের ছেলে,
পারি নে থাকিতে ফেলে;
তোর তরে আঁখি-নীরে বুক ভেসে যায়!
উজল মধুর বেশে,
সহাস নিকটে এসে
'মা' বলে আবার কবে ডাকিবি—আমায়?
শুনি সে অমিয় তান,
পুলকে পূরিবে প্রাণ
বহিবে অমৃত-স্রোত শিরায় শিরায়!
কেন গেলি? কোথা গেলি? আয় ফিরে আয়!"

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

মৃত-সৎকার।

মৃত-সৎকারের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক মানবগণ অনুভব করুন, আর নাই করুন—পূর্ব্বতিহাসে যে ইহার আবশ্যকতা বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া যাইবে। যে দিন হইতে মানুষকে ভূতপ্রেতের ভয় বিভীষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই মানুষও মৃতের মৃত দেহটীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রয়োজনীয় মনে করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক, আদৌ মৃতপ্রেতের ভয় মানুষের মনটাকে কিরূপে অধিকার করিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

একজন পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তাহার অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তাহাকে নির্জ্জনে রাখিয়া দিল; আশা, শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, সে পুনর্জ্জীবন পাইতে পারে। কিন্তু তাহা ত হইবার নহে। সুতরাং মৃতদেহ হয় 'মামিফায়েড' (mummified) অর্থাৎ মৃতদেহকে নানারূপ মসলা দিয়া শুষ্ক করিয়া রক্ষিত করা (যেমন Africa ও Peru দেশে) হইয়া গেল; নচেৎ তাহা গলিত হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। দেহ নষ্ট হইল বটে, তাহার আত্মীয়-স্বজন কিন্তু কত দিনই নানা স্বপ্নে, নানা মূর্ত্তিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল,—কখনও বা শান্তমূর্ত্তিতে, কখনও বা রুদ্রমূর্ত্তিতে, কখনও বা বীভৎস মূর্ত্তিতে! দেহ নষ্ট হইল,—তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, তথাপি তাহাকে দেখা যায় কিরূপে?

এই স্বপ্নদৃষ্ট এবং মনঃকল্পিত মূর্ত্তি তদানীন্তন সরলবুদ্ধি পূর্ব্বপুরুষগণকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। তখন মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের কার্য্যবিধি-সম্বন্ধে (actions of the Nervous System) কোন জ্ঞানই মানুষের অধিগত হয় নাই। স্বপ্নকল্পিত মৃত আত্মীয় দর্শনে মানব ক্রমে ক্রমে একটা পরলোকের বা মৃতরাজ্যের বা স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করিতে বাধ্য হইল। মৃতের গলিত দেহ এবং বীভৎস দৃশ্য মানবের পূর্ব্বপুরুষগণের সরল স্বপ্নকে ক্রমে কণ্টকিত করিয়া তুলিতে লাগিল—এবং ফল এই হইল যে, মানব ক্রমে ভূত বা বেতালের (Vampire) নামে ভীত হইতে লাগিল।

এই ভীতি হইতেই প্রেতাত্মার উপাসনার সূত্রপাত। কিন্তু তাহা যখন বিফল হইল, তখন মৃতদেহকে বদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল; যাহাতে পুনরায় সে আর লোকালয়ে আসিয়া জীবিতগণের উপর উপদ্রব না করে। মহামতি Herbert Spencer নানা অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ভূত বা Vampire বদ্ধ রাখিবার বহু অপূর্ব্ব এবং অদ্ভুত প্রকারের নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন। পার্ব্বত্য গুহায় বা মাটীর মধ্যে গর্ত্ত কাটিয়া মৃতদেহকে বদ্ধ রাখিবার একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই "গোর" দিবার ব্যবস্থা সর্ব্বদেশেই প্রচলিত হইয়া গেল। জার্ম্মেনি বা শস্যশ্যামল দেশে এখনও পর্য্যন্ত দুষ্ট ভূতের গোরের উপর পথিক-মাত্রকেই পাথর চাপাইতে হয়, বিশ্বাস,—গুরুভার "গোর" ভেদ করিয়া উঠিতে ভূতের সামর্থ্যে কুলাইবে না। স্বর্গগত মহাত্মা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে ভারতবর্ষের আর্য্যদিগের মধ্যেও প্রায় চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে গোর দিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এত প্রকারের দুরূহ কঠিন ব্যবস্থা সত্ত্বেও জীবিতগণের উপর ভূতের উৎপাত শেষ হইল না—জীবিতগণের কর্ণে, স্বপ্নে, বিপদে-সঙ্কটে মৃত এবং মৃত্যুভীতির অবধি নাই। ভূত (Revenant) যখন কিছুতেই "বাগ" মানিল না, তখন মানুষ একবার শেষ চেষ্টা করিল;—মৃতদেহকে দগ্ধ করিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে বিশেষভাবে শাস্তি দিবার চেষ্টা করিল। মানুষের বস্তি-প্রদেশের অস্থিটুকু (sacral region) কষ্টদায়ক; এইজন্য এই অংশটুকুর sacred বা পুণ্যময় বা পবিত্র নামকরণ করিয়া নদী বা সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আশা,—লোকালয়ের বাহিরে চলিয়া যাউক্।

মৃতদেহ দগ্ধ করিবার আধুনিক ব্যাখ্যা যাহাই হউক,—ইহা আদৌ যে ভূত জব্দ করিবার ব্যবস্থা, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু হায় হায়, মানুষের এত চেষ্টা সকলই বিফল হইয়াছে,—এত দুঃখ দেওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞ সাধারণের নিকট ভূত যেমনকার তেমনি অবাধ্যই আছে;—কেবল মাত্র এখনকার দগ্ধ ভূত একটু অতিরিক্ত মাত্রায় অশরীরী হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের জন্মভূমি কিন্তু সর্ব্ববিষয়েই সকলের অগ্রগামী। আমাদের সোনার ভারত সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা অর্থাৎ সারগর্ভা, সুতরাং পৌরাণিক যুগে ঐ অতিরিক্ত মাত্রায় অশরীরী দগ্ধভূতের উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছে। সে ব্যবস্থা গয়ায় পিণ্ড দান। বিশেষজ্ঞগণ কহেন,—ভূত-ভয়-নিবারণের

ইহা একেবারে চরম নিষ্পত্তি। গয়ার বিষ্ণু-পাদে বৃহৎ অসুরের সুবৃহৎ করোটীর উপর ক্ষুদ্র অসুরদিগের মুণ্ডপাত! ইহাতেও আর ভূতভীতি তিরোহিত হয় না? ইহা যে অষ্ট-রজ্জুসম্মিলন-বিশেষ!

আমরা এতক্ষণ যাবৎ পরলোকবাসীদিগের physical অর্থাৎ দৈহিক দৃশ্যটার আলোচনাতেই ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু ইহার একটা spiritual বা আত্মিক দৃশ্যও আছে। আমাদের অতিপ্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ Cerebrum এর কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন কি না জানি না—কিন্তু তাঁহারা দেহাতিরিক্ত একটা কিছুর সত্তা যে অনুভব না করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সেই দেহাতিরিক্ত "কিছুর" যথার্থ অর্থ সম্প্রতি ধরা পড়িয়াছে। Psycho-physiology এবং Psycho-Pathology অত্যন্ত আধুনিক এবং ইহা এখনও বাল্যাবস্থায় বলিলেও চলে। যাহা হউক, প্রাচীনগণ তাঁহাদের অনুভূত অপরিস্ফুট দেহাতিরিক্ত "কিছুকে"—spirit, আত্মা প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিশ্চিত অর্থে ব্যাখ্যাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ঠিক্ করিয়া লইলেন যে, আমাদের এই দেহটা spirit বা আত্মার বাসস্থান মাত্র;—দেহটা স্থূল বহিরাবরণ—সূক্ষ্ম আত্মাই সার পদার্থ। পূর্ব্বপুরুষগণ যখন মৃত দেহটাকে শাস্তি দিবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তখন ধীরে ধীরে এই "আত্মবাদ" তাঁহাদিগকে একটা নূতন আলোক প্রদান করিল। এই "আত্মবাদ" বিশেষভাবে গ্রহণ করিলেন গ্রীস, আর আমাদের ভারতবর্ষ। উক্ত "আত্মবাদের" স্ফুটতর অবস্থায় ঐ দুই-দেশ হইতেই মৃতদেহের "গোর" দিবার ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়া তৎস্থানে দগ্ধ করিবার ব্যবস্থা স্থান লাভ করিল। কারণ, দেহটাকে দগ্ধ না করিলে মৃতের সূক্ষ্ম আত্মা বহুকালের আবাসভূমি স্থূল দেহটার অণুপরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে কিরূপে?

শ্রীঅমরেন্দ্র সাহা।

শোকাশ্রু।

(একান্ত স্নেহভাজন সাহিত্য-সেবক মহীন্দ্রমোহন চন্দের অকাল-বিয়োগ)

হে স্নেহভাজন!
এ কি নিদারুণ বাণী
আনিল এ পত্রখানি!
এ কি হায়, বজ্রধ্বনি, এ কি অভিশাপ!—
আমাদের নাহি ব'লে,
তুমি নাকি গেছ চ'লে,
নিষ্ঠুর পত্রের মত?—এ যে গো প্রলাপ!

সেই মুখ সেই হাসি
নেত্রে যে আসিছে ভাসি,
সে যুগ নয়ন ভরা কত অভিমান;
সেই মধুমাখা কথা,
ভুলায় ব্যথীর ব্যথা,
সেই উদারতা-ভরা সরল পরাণ!

আ-মরি! মধ্যাহ্ন-রবি,
অমন উজল ছবি,
নবমল কাল রাহু গ্রাসিয়াছে তা'য়!
এ কি রে ভীষণ দৃশ্য,
আঁধার নিখিল বিশ্ব,
নিবিয়াছে সব আলো,—এ কি সহা যায়!

তুমি ত পরের ছেলে,
"মা" বলিয়া কেন এলে,
কেন বা মমতা মায়া দিয়াছিলে ঢালি?—
জানেন অন্তরযামী
কিছুই চাহি নি' আমি,
তবু দিলে, সেধে দিলে হিয়া করি খালি!

তাই আজি বাঁধ টুটে,
শোকের লহরী ছুটে,
জানি না নিঠুর ছেলে বসি কোন্‌খানে,
দুরন্ত বালক-প্রায়,
দেখিছ হাসিছ হায়!—
নিলে এই প্রতিশোধ সেই অভিমানে!

কত দিন "দুই ছত্র"
লিখিতে পারি না পত্র,
তাই কি করেছ রাগ হে প্রিয়দর্শন?—
তাই কিছু নাহি ব'লে,
একেবারে গেছ চ'লে,
আঘাতিয়া শক্তিশেল ভেঙে চুরে মন?

সেই মায়া আদরিণী,
তারে করি অভাগিনী,
হিমু, গুলু, শকুন্তলা, কাঁদায়ে সবায়,
সবাই কি গেলে তুমি
ত্যজি এ ভরত-ভূমি!—
সে পূজ্য শ্বশুরে দিলে পুত্র-শোক, হায়!

যে কদিন বেঁচে থাকি,
সেই মুখ মনে আঁকি
র'ব সদা—মহীন্দ্র যে নহে ভুলিবার!
আহা! সে দুরন্ত-পণা,
আবদার, ভঙ্গি নানা!—
সে যে কভু বুঝিত না পর আপনার!

সরস লেখনী তার,
গাঁথিত কবিতা-হার,
সে যে রে স্বভাব-কবি, সুপুত্র বাণীর!
বিজনে কুসুম ফুল,
কে বোঝে তাহার মূল্য,
নিভৃতের নদ সে যে সুধা-মাখা নীর!

যাও বৎস! থেক সুখে,
চির শান্তি পাও বুকে,
অজর অমর দেশে,—তবু মনে লয়,
আমরা ত সেথা নাই—
ভাল কি লাগিবে তাই?
সেথা কি পরের ছেলে আপনার হয়? *

শ্রী'বীরকুমারবধ'-রচয়িত্রী।

---

* বামাবোধিনীর পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ৺মহীন্দ্রমোহন চন্দ মহাশয় সুপরিচিত। ইনি এবং ইঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ বহুদিবসাবধি কবিতা ও প্রবন্ধাদি দ্বারা বামাবোধিনীর উৎকর্ষ-সাধনে যত্ন করিয়াছেন। তাহার এই অকাল-বিয়োগে আমরা যার পর নাই দুঃখানুভব করিতেছি। ভগবান্ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা। সং।

গানের স্বরলিপি।

মিশ্র বেহাগ—খাম্বাজ। একতালা।

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো।
আবার কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন প্রদীপ জ্বালো!
রাখিস্ না আর মায়ায় ঘেরে, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে দে রে—
উধাও হ'য়ে মিশিয়ে যাই, এমন রাত আর পাবো না লো!
পাপিয়ার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে;
থামা এখন বীণার ধ্বনি, চুপ করে' শোন্ বাইরে এসে;
বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালোবেসে—
এখন যদি মর্ত্তে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো!
সাঙ্গ আমার ধূলা খেলা—সাঙ্গ আমার বেচা-কেনা;
এয়েছি করে' হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না;
যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো।

কথা ও সুর—৺মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২ ৩ ০ ১
পা ধা না। না না না ॥ না না র্সা। না ধা ধা। ধা না ধা। পক্ষা-া গরা ।
নী ল আ কা শে র অ সী ম ছে ০ য়ে ছ ড়ি য়ে ০ গে ০ ছে ০

২ ৩ ০ ১
। রগা রগা মপা। পক্ষা গা -া। রগা রগা পা। ক্ষা-া পা ।
চাঁ০ দে০ ০র আ০ লো ০ ০আ বা০ র কে ০ ন

২ ৩ ০ ১
। পা পা পা। পা পা পা। ক্ষা ক্ষা ক্ষপা। গা রা -া ।
ঘ রে র ভি ত র আ বা ০ র কে ন ০

২ ৩ ০ ১
। রগা রগা ক্ষপা। ক্ষা -া গা। ঋা ঋা ঋা। ঋা ঋা ঋা ।
প্র০ দী০ ০প জ্বা ০ লো রা খি স্ না আ র

২ ৩ ০ ১
। র্রা র্রা র্রা। র্রা র্রা -া। রা গা র্রসা। না ধা না ।
মা য়া য় ঘে রে ০ স্নে হে ০র বাঁ ধ ন

২ ৩ ০ ১
। পধা পধা র্সা। র্সা র্সা র্সরনা। না না র্সা। ধা ধা না ।
ছিঁ ড়ে ০ দে রে ০০০ উ ধা ও ০ হ য়ে ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা ধপা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা পা পা। ধা ঋা ঋা I
মি নি ০ মে ০ যা ই এ ম ন রা ত আ

২ ৩
I ঋা রা র্রা। -া র্রগর্রা র্সনধা II
র পা বো ০ না০০ লো০০

০ ১ ২ ৩ ০
রা রগা রগা। পা পা পা II পা পা পা। ধা ক্ষা ক্ষক্ষা। ক্ষপা পক্ষা -া I
পা পিয়া ০র ঐ আ কু ল তা নে ০ আ ক্ষা০ ০শ ভু০ ০
সা ০০ ০ঙ আ মা র ধূ লা ০ খে লা ০০ সা০ ০শ ০

১ ২ ৩ ০ ১
গা রা রগা I রগা পা -া। পক্ষা গা -া। ধা না -া। না না না I
ব ন গে০ ল০ ০ ০ ভে০ সে ০ খা মা ০ এ খ ন
আ মা ০র বে০ চা ০ কে০ না ০ এ যে ছি ক ০ রে

২ ৩ ০ ১
I না নর্সা র্সা। না ধনা সনধা। ধা না ধা। ধা পা রা I
বী ণা০ র ঝ নি০ ০ ০ চু পু ক রে ০ পো
হি সে০ ব নি কে০ ০ ০শ যা হা র ষ ত পা

২ ৩ ০ ১
I রা গা ধা। ধা ধা ধা। ধপা ধা ঋা। ঋা ঋা -া I
ন বা ই রে এ সে ০বু ক এ গি য়ে ০
ও না ০ দে না ০ ০আ জি ব ড় ০ ই

২ ৩ ০ ১
I র্রা র্রা -া। র্রা র্রা র্রা। র্রগা র্রা র্সা। না না ধা I
আ সে ০ ম র ণ মা০ য়ে র ম ত ০
শ্রা ০ ন্ত আ মি ০ ও০ মা ০ কো লে ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা র্সা। র্সা র্রা ননা। না না র্সা। ধা ধা না I
ভা লো ০ বে সে ০০ এ খ ন য দি ০
তু লে ০ নে না ০০ যে খা ০ নে ঐ ০

২ ৩ ০ ১
I পা পা ধা। ক্ষা ক্ষা ক্ষা। ক্ষা পা -া। ঋা ঋা -া I
ম রু তে না পা ই ত বে ০ আ মা র
অ সী ম সা দা র মি শে ০ ছে ঐ ০

২ ৩
I র্রা র্রা র্রা। ঋর্রগা ঋর্রসা র্সনধপা II II
ম র ণ ভা০০ লো০০ ০০০০
অ সী ম কা০০ লো০০ ০০০০

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

অকস্মাৎ আনন্দ-বেদনার উচ্ছ্বসিত প্লাবনে নমিতার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিনের পর দুই বাহু প্রসারিত করিয়া অসঙ্কোচ আবেগে ক্ষুদ্র শিশুর মত সমিতাকে সে বুকে টানিয়া লইয়া, কম্পিত ওষ্ঠে তাহার ললাট চুম্বন করিল। অবাধ চক্ষের জল অজ্ঞাতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া সমিতার কেশরাশির উপর ঝরিয়া পড়িল। নমিতার কণ্ঠস্বর ভাল ফুটিল না, তথাপি সমিতা তাহার অস্ফুট উক্তি শুনিতে পাইল,—"আজ যদি বাবা থাকতেন, মেসুন!"

সমিতা ছাত্রী-জীবনে এইবার সবে মাত্র পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, আনন্দ-উত্তেজনায় আজ তাহার মন দৃপ্ত প্রফুল্ল, আজিকার আহ্লাদের মধ্যে হয় ত স্নেহময় পিতার অভাব-বেদনা তাহার কিশোর চিত্তের নির্ম্মল অঙ্কে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু এতক্ষণে, বোধ হয়, নমিতার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ-সংঘাতে সেই সুপ্ত বিয়োগ-বেদনা তাহার মনকে বিচলিত করিয়া তুলিল। সরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া, চট্ করিয়া আমার আস্তিনে চোখের জলটুক্ শুষিয়া মুছিয়া, রুদ্ধ কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিবার জন্য কাশিয়া, ভাঙ্গা গলায় সে বলিল, "দিদি, বইয়ের লিষ্ট এনেছি, খান-তিনেক নতুন বই চাই; বাক্সী ছোড়্‌দার কাছে পাব।"

নমিতা আঁচলের খুঁটে চোখের কোণ মার্জ্জনা করিতে করিতে হাসি-মুখে বলিল, "আজই আনিয়ে দেব;—আর, এবার তোকে কি 'প্রাইজ' দোব, বল্ ত?—"

ব্যস্ত হইয়া সমিতা বলিল, "না দিদি, না,—তুমি যে হাতের রুটি দু'গাছা,—নাঃ, ও কিছুতেই খুল্‌তে পাবে না, গয়না ফয়না চাই নে;—যদি একান্ত কিছু দাও, তা' হ'লে—।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "তা' হ'লে কি—?"

ইতস্ততঃ করিয়া সমিতা কণ্ঠস্বর নামাইয়া সলজ্জভাবে বলিল, "যদি কোথাও বাড়তি টাকা পাও ত আমায় ছোড়্‌দার মত একটা 'কাউন্‌টেন্ পেন্' কিনে দিও,—।"

ন। তথাস্তু, আচ্ছা। মাকে পাশের খবরটা দিয়ে এসেছিস্?

স। আমি আগেই তোমার কাছে এসিছি। সুশীল সদর দুয়ার থেকে মার কাছে ছুটেছে; মা এতক্ষণ—।

সমিতার স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া, সস্নেহ ভৎর্সনার স্বরে নমিতা বলিল, "দিনে দিনে ভারী বোকা হয়ে উঠ্‌ছিস্! আগে মাকে খবর দিয়ে তবে আমাদের কাছে আস্‌তে হয়।—যা এখুনি—।"

লজ্জিতা সমিতা তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। দ্বারের বাহিরেই বিমলের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। বিমল কি এক-খানা বইয়ের জন্য স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়াছিল। সমিতাকে অত ব্যস্তভাবে ছুটিতে দেখিয়া সে বলিল, "কি রে খেঁদী, খবর কি?"

নমিতা থমকিয়া দাঁড়াইল; উৎসুকভাবে ছোড়্‌দাকে সুখবরটা শুনাইতে উদ্যত হইয়া, তখনই দিদির কথা স্মরণ হওয়ায়, চোক্ গিলিয়া থামিল। তাহার পর দ্রুতস্বরে বলিল, "একটা খবর আছে, ছোড়্‌দা! এসে বল্‌ছি—।" দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষা না করিয়া সে আবার ছুটিল।

বিমল বিস্মিত হইয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার আগেই নমিতা সস্নেহে কৌতুকস্মিত-বদনে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি তার আগেই খবরটা বলে দিই;—ছোড়্‌দা অনেক খেটেছে; ওর গুরু-দক্ষিণাটা ফাঁকী দিলে চল্‌বে না।—সেলুন এবার ক্লাশের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়েছে, বিমল!"

"বটে? তা' হলে ত মানুষ হয়ে গেছিস্ রে! আচ্ছা, আমি স্কুল থেকে ফিরে আসি, তারপর সব জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো।" নমিতাকে এই কথা বলিয়া বিমল ঘরে ঢুকিল ও তাহার বইয়ের আল্‌মারি খুলিয়া প্রয়োজনীয় পুস্তক-খানি লইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সহসা তাহার স্বভাবচঞ্চল দৃষ্টি টেবিলের উপরকার চিঠিখানার উপর পড়িল। উৎসুক-ভাবে সে বলিল, "কা'র চিঠি দিদি?"

চিঠির কথা তখন নমিতা ভুলিয়াই গিয়াছিল। বিমলের প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ডাক্তার মিত্রের—"। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে বিষম খাইয়া কাশিয়া উঠিল ও অন্যভাবে চিঠিখানা উল্টাইয়া হাতের নীচে চাপা দিয়া, খুব সহজভাবে উত্তর দিল—"এইখানকারই একটি ভদ্রমহিলা লিখ্‌ছেন, তাঁর কি দরকার আছে, তাই একবার সময় মত গিয়ে দেখা কর্‌তে অনুরোধ করেছেন।"

নমিতা এমনই ভাবে কথা-কয়টি কহিল যে, উক্ত ভদ্রমহিলাটি যে তাহার কিছুমাত্রও পরিচিতা নহেন, এ-কথাটুকু বিমল আদৌ অনুমান করিতে পারিল না। সুতরাং, নিশ্চিন্ত হইয়া সে ছোট একটি "অ—" বলিয়া, নিজের কাজে চলিয়া গেল।

বিমল স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নমিতা নিজের মধ্যে কেমন যেন দ্বৈধগ্রস্ত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ঘরের বা বাহিরের এমন কোনও পরামর্শ, এমন কোনও প্রয়োজন নাই, যাহা বিমলের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। বিমল বরং অনেক সময় পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়, কিন্তু তাহার ন্যায়ান্যায় বোধকে যথাযথভাবে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার জন্য নমিতা নিজেই প্রায়শঃ উপর-পড়া হইয়া তাহাকে সেই ভিড়ের মধ্যে টানিয়া আনে। তবে আজ কেন নমিতা তাহার কাছে এই ব্যাপারটা চাপিয়া গেল? বিমলের প্রশ্নের উত্তরে সে বেশ সহজভাবেই পত্র-লেখিকার প্রয়োজনটুকু ব্যক্ত করিতে পারিল, কিন্তু তাঁহার পরিচয়টুকুর বেলা, কেন আপনা হইতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল?

ঠিক! ঐ পরিচয়টাই শুধু যত দুর্ব্বার মূল! ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর নামে শুধু ডাক্তার মিত্রকেই মনে পড়িতেছে, ডাক্তার মিত্রের চরিত্রটাই স্মরণ হইতেছে!...যদিও ডাক্তার মিত্র এ-পর্য্যন্ত নমিতার সম্পর্কিত ব্যাপারে কখনও অন্যায় আচরণ প্রকাশ করেন নাই, অথবা করিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু তবুও তিনি যে কি প্রকৃতির মানুষ, তাহা নমিতার অগোচর নাই! তাই তাঁহার সম্পর্ক-সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হয় না!

নিজের চিন্তার মাঝখানে নমিতা নিজেই চমকিয়া উঠিল। এতবড় প্রকাণ্ড সত্যকে ইহার পূর্ব্বে সে একদিনও অনুভব করিবার অবকাশ পায় নাই! ডাক্তার মিত্রকে সে ভয় করিয়া থাকে; তাই নিজের অজ্ঞাতে তাহার মন ডাক্তার মিত্রের সংস্রব এড়াইয়া যথাসম্ভব দূরে দূরে—অন্তরালে থাকিয়া চলে। তাহা না হইলে, তাহার দৃষ্টিতে অগ্রজ অনিলও যেমন, সুরসুন্দরও তেমনই; হাঁসপাতালের সত্যবাবুও তাই; এবং ডাক্তার মিত্রও তাহা ছাড়া আর কিছু অপূর্ব্ব বস্তু নহেন। কিন্তু তাঁহার ন্যায়-বিগর্হিত ব্যবহারগুলাই তাঁহার স্বভাবকে অস্বাভাবিক ক্রূরতায় নিন্দনীয় ও অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে! কিন্তু শুধু তাহা হইলেও রক্ষা ছিল,—ধৈর্য্যের তেজ থাকিলে মানুষের ক্রোধকে সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু ক্রোধের উর্দ্ধস্থ দুরন্ত রিপুকে স্বেচ্ছায় প্রশ্রয় দিয়া যে মানুষ পাশবিক আনন্দে—!

নমিতার চিন্তা এইখানে সহসা স্তম্ভিত হইল। তাহার আপাদ-মস্তকে দৃপ্ত বিদ্রোহিতা যেন হঠাৎ তীব্র হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিল! ভাব-প্রবণ হৃদয়ের সমস্ত প্রফুল্লতা কোমলতা হঠাৎ উগ্র থাকা খাইয়া বেদনায় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল!—অসহ্য, অসহ্য! মানুষের নির্ব্বোধ মূঢ়তার সব ত্রুটি ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা! না! একেবারে অসহ্য!

নমিতার চিন্তাশক্তি নিজের মধ্যেই ক্ষুব্ধ অপমানে স্তব্ধ হইয়া গেল; চিত্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল; উত্তেজনা-উষ্ণতায় অর্দ্ধ-আর্দ্র মস্তকের চুলগুলা আবার ঘামে পুরামাত্রায় ভিজিয়া উঠিল। ভীষণ চাঞ্চল্যে নমিতার ইচ্ছা হইল, সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়ে, কিন্তু সে সঙ্কল্প-মাত্রেই সে তখনই যেন একেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল! মনে হইল, এখনই যদি ভাই-বোনেরা কেহ আসিয়া সামনে দাঁড়ায়, তাহা হইলে এই অবস্থায় কেমন করিয়া নমিতা দৃষ্টি তুলিয়া তাহাদের সহিত চোখোচোখী করিবে!

অধীর-কম্পিত চরণে নমিতা ঘরের বাহিরে আসিল; নিঃশব্দে বাড়ীর উঠান পার হইয়া বাহিরের নির্জ্জন বারেণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বারেণ্ডার সম্মুখে বৈশাখের তৃতীয় প্রহরের বিষম রৌদ্রতপ্ত পথ সম্পূর্ণরূপেই জন-মানব-শূন্য;—অদূরে মোড়ের মাথায় কাঁটাল গাছের তলায় শুষ্ক পত্রগুলা খড়্ খড়্ মড়্ মড়্ শব্দে মাড়াইয়া একটা ছাগল হেঁট-মুখে আহার খুঁজিয়া ফিরিতেছিল; আর কোন দিকে কেহ নাই,—কিছু শব্দ নাই। দ্বিপ্রহরের অগ্নিজ্বালানিভ উষ্ণ বাতাস থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিয়া বহিতেছিল।

পশ্চাদ্বদ্ধ-হস্তে বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে করিতে নমিতা অন্যদিকে চিন্তাগতি ফিরাইয়া বিক্ষিপ্ত মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ক্ষণেক পরে আপন মনেই নিঃশব্দে হাসিল,—কি নির্ব্বোধ সে! সত্যই ত, তাহার এত রোখ্ কেন? ডাক্তার মিত্র ত নমিতার পিতাও নহেন, ভ্রাতাও নহেন; অধিক কি, রক্ত-সম্পর্কে ধরিতে গেলে, তিনি ত সম্পূর্ণ ই 'পর'! তাঁহার রুচি সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক, নমিতার তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তবে কেন তাঁহার চরিত্র-কুৎসা নমিতার মনকে ক্লিষ্ট ও নিষ্পীড়িত করে?

কিন্তু না, ঐ একটি মাত্র মুখ-চেনা মানুষ নহে। উঁহার মত প্রত্যেক উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের নর-নারীর জন্য নমিতার মন ঠিক এমনই মূক বেদনা অনুভব করে! মানুষের এ দৌর্ব্বল্য-কলঙ্কে, হায়, মানুষ হইয়া কেমন করিয়া সে বলিবে—'আমায় তাহাতে কি?' না হউক্ তাঁহাদের লইয়া সংসার করিতে, না হউক্ তাঁহাদের লইয়া সমাজে থাকিতে,—তবু তাঁহাদের হীনতার কাহিনী, নীচতার স্মৃতি নমিতার মনকে কতখানি বেদনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত করে, তাহা নমিতা জানে, আর অন্তর্যামী জানেন!

শব-ব্যবচ্ছেদের যন্ত্রাদি প্লেটের উপর সাজাইয়া দৌদ্রদগ্ধ পথের উপর দিয়া পুড়িতে পুড়িতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁসপাতালের লাল্লু ছুটিয়া আসিতেছিল। নমিতাকে দেখিয়া, কপালে হাত ঠেকাইয়া সে বলিল, "সেলাম মাইজী!"

নমিতা চমৎকৃতা হইয়া দাঁড়াইল! লাল্লুর অভিবাদনের কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। সভ্যতার খাতিরে হাঁসপাতালে সে নমিতা প্রভৃতিকে কখনও 'মেম্-সাব্' বলিত, কখনও বা অভ্যাস-বশে 'মাইজী' বলিত। কিন্তু আজ সেই পুরাতন সম্ভাষণ নমিতার কানে হঠাৎ অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও নূতন বোধ হইল। এমন মিষ্ট, এমন মনোরম অভিবাদন সে যেন আর কখনও শুনে নাই! তাহার সমস্ত হৃদয় অপূর্ব্ব স্নিগ্ধরসে ভরিয়া উঠিল। বয়সের অজুহাতে যুবক লাল্লুর নিকট তাহার যেটুকু সঙ্কোচের ব্যবধান ছিল, তাহা সহসা যেন উচ্ছল স্নেহের মুক্ত প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া ভাসিয়া গেল! বিস্মিতা নমিতা চাহিয়া দেখিল, ঐ তরুণ বয়সের কোনওখানে উদ্দাম যৌবনের উগ্র জ্বালা নাই;—কোন বিভীষিকা সেখানে তিষ্ঠাইবার স্থান পায় না! সেখানে শুধু কৈশোরের লালিত্য, শৈশবের কমনীয়তা স্নিগ্ধ আনন্দে বিরাজমান!—এক নিমিষে নমিতার সমস্ত প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল!—ক্ষুদ্র হউক, তবু এই ত মানুষ! অগ্রসর হইয়া সস্নেহে নমিতা বলিল, "কোথা যাচ্ছ এত রৌদ্রে, লাল্লু?"

নমিতার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্যই হউক্, অথবা বারেণ্ডার শীতল ছায়ায় কথঞ্চিৎ ক্লান্তি অপনোদনের আশাতেই হউক্, হাঁপাইতে হাঁপাইতে লাল্লু বারেণ্ডায় উঠিল; প্লেটটা নামাইয়া, কোমরে জড়ান গামছা খুলিয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, পুলীশের মারফৎ একটা জলে ডোবা পচা মড়া আসিয়াছে। মৃত্যুটা উদ্বন্ধন কি বিষপান, না কি?—এইরূপ একটা সন্দেহজনক জনরব উঠিয়াছে। অতএব ব্যবচ্ছেদ-ব্যতিরেকে মৃতদেহটার সদ্গতি অসম্ভব। সুতরাং, কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা মত মৃত দেহ অদূরে মাঠে, শব-ব্যবচ্ছেদাগারে আনীত হইয়াছে। ডাক্তার মিত্রও শীঘ্র সেইখানে যাইতেছেন, তাই লাল্লু আগে আগেই যন্ত্রে বোঝা লইয়া ছুটিয়াছে। কি জানি, বিলম্বে ত্রুটিতে যদি থাপ্পা হইয়া ডাক্তারবাবু তাহ 'শিয়ুতোড়েঙ্গা' বলিয়া বাঘ্না ধরিয়া বসে কে বলিতে পারে?

পূর্ব্ব-কথা নমিতার স্মরণ হইল; বুঝিল, সেইদিনের পর হইতে লাল্লু সতর্কভাবে ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে, শুধু একহাত নহে,—পুরা একশত হাত মাপিয়া চলিতেছে। উদ্যত বজ্র যে-কোনও মুহূর্ত্তে তাহার মাথার উপর যে অনিশ্চিতরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, তাহা

সে নিশ্চিত বুঝিয়া লইয়াছে।—নমিতা কোন কথা কহিতে পারিল না, নীরবে সকরুণ ছল্-ছল্ নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

বক্তব্য শেষ করিয়া লাল্লু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া বলিল,"আপ্‌কো নোকর লোগ্ কাঁহা হৈ?"

নমিতা প্রশ্ন করিল, "কেন লাল্লু?"

সঙ্কুচিত হইয়া লাল্লু বলিল, "থোড়া পিয়াস্ লাগল্ হৈ; এক চুক্ পানি,—!"

লজ্জিত নমিতা বলিয়া উঠিল, "আমি এনে দিচ্ছি, তুমি দাঁড়াও—।"

ব্যস্ত হইয়া লাল্লু বলিল, "নেই নেই, আপ্‌কো নোকর্—।"

গমনোদ্যতা নমিতা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, লাল্লু! হলেই বা, আমি এনে দিচ্ছি।—'মাই-জী'র হাতে কি পানি খেতে নেই?"

শিশুর মত সলজ্জ বিনয়ে ঘাড় ফিরাইয়া হাসিয়া লাল্লু সসৌজন্যে বলিল, "বহৎ, খুব।"

কৃতার্থ আনন্দে নমিতার সমস্ত বুক সুগভীর স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

অঘর ও পৌরীপাড়ে ও-দিকের ঘরে ঘুমাইতেছে; লছ্‌মীর মা ও অপর সবাই মাতার ঘরে কথা কহিতেছে, শুনিতে পাওয়া গেল; কিন্তু কাহাকেও ডাকিতে নমিতার ইচ্ছা হইল না। নিজেই এ-ঘর ও-ঘর খুঁজিল, লাল্লু ঘটি বা গেলাশ একটাও পাইল না,—সব উচ্ছিষ্ট ক্ষেত্রে পড়িয়া আছে! দ্বিধা মাত্র না করিয়া নমিতা নিজেই একটা গেলাশ টানিয়া লইয়া, একমুঠা ছাই ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিল। পরে নিজের হাত-পা ধুইয়া, ঘরের কলসী হইতে জল গড়াইয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "খাও লাল্লু—!"

হাসপাতালে প্রয়োজন-ব্যপদেশে অনেক সময় ইহাদের সহিত হাতে-হাতে জিনিস-পত্র নেওয়া-দেওয়া করিতে হয়। সুতরাং, অভ্যাস-বশে নমিতার এ-সম্বন্ধে সঙ্কোচ জড়তা কাটিয়া গিয়াছিল। সেইজন্যই, বোধ হয়, সে লাল্লুর হাতে দিবার জন্য গেলাশটা তুলিয়া ধরিয়াছিল, কিন্তু লাল্লু কুণ্ঠিতভাবে পিছু হটিয়া গেল। পয়সার খাতিরে গোলামীর ক্ষেত্রে যে সম্মানকে সে বাধ্য হইয়া লঙ্ঘন করিয়া চলে, এখানে—মুক্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে, তাহার উচ্চতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে, বোধ হয়, তাহার প্রবৃত্তি হইল না; মস্তশিরে পিছাইয়া ভূমির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল,—"জী, হিঁয়া ধর্ দিজিয়ে।"

নমিতা ঈষৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখ-পানে চাহিল; কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিনা বাক্যে গেলাশটি নীচে নামাইয়া দিল। হাঁ, ঠিক্, মাতাপুত্রের সম্পর্ক!—যাহা সে কয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ-ভাবে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিল, তাহা শুধু অন্তরের সম্পত্তি! বাহিরের লৌকিক ব্যবহার লোকাচার-সম্মত বিধানানুসারেই অবশ্য প্রতি-পাল্য; ইহাকে লঙ্ঘন করা আদৌ শোভনীয় নহে।

বাঁ-হাতে গেলাশ ধরিয়া ডান্ হাতে জল ঢালিয়া, লাল্লু এক নিঃশ্বাসে চৌ চৌ করিয়া সমস্ত জলটুকু শুষিয়া লইল; তারপর গেলাশটা দ্বারের চৌকাঠের পাশে নামাইয়া রাখিল। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "আপ্‌কো তক্‌লীফ্ দিয়া।"

ঘরের ক্লক-ঘড়িতে টং টং টং করিয়া তিনটা বাজিল। ব্যস্ত লাজু, "ভাংদার বাবুকা আনেকো 'টাইম' হো গিয়া,—সেলাম মেম-সাব", বলিয়া অভিবাদন জানাইয়া ঘরের প্লেট তুলিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নমিতাও মাথাটা খুব ঝুঁকাইয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া সেলামের প্রত্যুত্তর জানাইয়া, দ্রুতগমন-রত লাজুর পানে নীরবে ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আহা রৌদ্রের বড় তেজ!

পরক্ষণে নমিতার মনে পড়িল, ঠিক্ এই রৌদ্রে অমনই ভাবে পুড়িতে পুড়িতে ডাক্তার মিত্রকেও ঐ পথে কর্ত্তব্য পালন করিতে যাইতে হইবে! এই ভাবিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মনের প্রচ্ছন্ন তিক্ততার উপর অজ্ঞাতে সুকোমল সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ যেন অমৃত ঢালিয়া দিল। বাস্তবিক, এমন সুন্দর শিক্ষিত, উচ্চাঙ্গের কর্ম্মঠ, গুণী ব্যক্তি। —ইহাকে কে না সম্মান করিবে? কিন্তু ইহার হৃদয়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে, নমিতার অন্তরের শ্রদ্ধা আপনা হইতেই ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে, ইহাই যে বড় পরিতাপের বিষয়! সংসারে মূর্খের অভাব নাই, এবং তাহাদের মূর্খতা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, তাহাতে দুঃখের বিষয় যথেষ্ট থাকিলেও দুঃখ করিবার মত অবকাশ বেশী নাই। কিন্তু দেশের এই সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানহীনের মত নিরর্থক খেয়ালের বশে অনর্থক শয়তানী খেলা!—ইহা যে বড় মনস্তাপ।

গেলাশটি তুলিয়া লইয়া নমিতা ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

(১৩)

মিনিট পনের পরে চুল পরিষ্কার করিয়া, হাত-মুখ ধুইয়া, মুছিয়া, জামা-কাপড় বদলাইয়া, নমিতা বহির্গমনের বেশে সুসজ্জিত হইয়া মাতার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কক্ষতলে মাদুরের উপর বসিয়া নমিতার মাতা সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতেছিলেন, সুশীল তাঁহার হাঁটুর উপর হেলিয়া বসিয়া সেই দিকে চাহিয়াছিল। নমিতা তখন স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়িয়া পাশের ঘরে ঝাড়ন লইয়া বিছানা-মাদুরের সুব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিল। লছমীর মা কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

নমিতা ঘরে ঢুকিতেই মাতা মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, "ক'টা বাজ্‌ল নমি? এর মধ্যে কি হাঁসপাতালে বেরুতে হচ্ছে?"

প্রসন্নমুখে খুব সহজভাবে নমিতা উত্তর দিল, "না, হাঁসপাতালে নয়। আমাদের ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

মাতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন?"

নমিতা উত্তর দিল, "কি দরকার আছে, তিনি তাই ডেকে পাঠিয়েছেন।" সুশীলের মুখ-পানে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "সিসিল, বেড়াতে যাবি?"

আগ্রহচ্ছন্দে, "হুঁ" বলিয়া সুশীল তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া পাশের ঘরে জামা-কাপড় পরিতে চলিয়া গেল। নমিতা মাদুরের প্রান্তে মাতার পায়ের কাছে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মা, সেলুনের বই কিন্‌তে হবে; বিমলেরও জুতো ছিঁড়ে গেছে। সংসার-খরচের টাকা থেকে এ-মাসে কিছু বাঁচ্‌বে কি?"

ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাতা ম্লান

ভাবে বলিলেন, "বুঝবে কি মা! এ-মাসে বাড়তি খরচ বড় বেশী হয়ে গেছে। তাই হিসেব করছিলুম! ঐ ছেলেটির অসুখের খরচে—বলতে নাই, এবার চৌদ্দ টাকার ওপর পড়েছে। গেল মাসের কিছু ছিল, তাই টানাটানি করে ঝুলিয়ে গেছে; না হ'লে ধার ভিন্ন গতি ছিল না।"

নতদৃষ্টিতে চাহিয়া, বাঁ-হাতের ঝুলি খুঁটিতে খুঁটিতে নমিতা বলিল, "কিন্তু এ খরচগুলো যে চাই-ই মা! মিস্ স্মিথ্ সময়-অসময়ে অনেক অনুগ্রহ কোরে থাকেন। কিন্তু আর ধার কোর্ত্তে পাবিনে। আপনি যদি কিছু না মনে করেন, তা হ'লে এই ঝুলি দু'-গাছা—।"

বিবর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে মাতা বলিলেন, "ঐ দু'গাছাই ত শেষ সম্বল আছে, নমি! কিন্তু ওর জন্যে ব্যস্ত হওয়া কেন? সংসারে সময়-অসময়ের জন্যে আপদ-বিপদের জন্যে কিছু সংস্থান রাখা চাই বই কি।"

সংসারে খরচের টানাটানির মুখে নমিতা আরও দুই-একবার নিজের ঐ অনাবশ্যক অলঙ্কারটা এইরূপে সদ্ব্যয় করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মাতার আপত্তিতে পারিয়া উঠে নাই। সে জানিত, তাহার এই সামান্য প্রস্তাবটা মাতার মনে কতখানি কঠিন আঘাত দান করে! কিন্তু উপায় নাই! অভাবের মুখে বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক অনিচ্ছাকে তাই বলিদান করিয়া চলিতে হয়। আজিও সে অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত তাহার মন্তব্য ব্যক্ত করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু মাতা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করাতে সে সুবিধা পাইয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক্ বলেছেন মা! আমিও ক'দিন থেকে ভাব্‌ছি কিছু সংস্থান রাখা চাই। এই ঝুলি দু'গাছা কোন কাজের জিনিস নয়, হাতে গুটিয়ে কাজ করবার সময় ভারি অসুবিধা ঠেকে; একে অনর্থক রেখে কোন লাভ নেই। দিই একে বিক্রী করে। যে ক'টা টাকা পাওয়া যায়, তা থেকে এদের জুতো আর বইয়ের খরচ কেটে নিয়ে, বাকী টাকা 'সেভিং ব্যাঙ্কে' জমা করে দিই।"

বড় দুঃখে মাতার মুখে একটু হাসি ফুটিল; বলিলেন, "কি দুষ্টু বুদ্ধি তোর নমি! তবু ওটা বিক্রী করবি-ই?—না। আমি ও বিক্রী করতে দোব না; 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কে'র টাকা রাত-দুপুরে দরকার হ'লে পাবি? আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, সে সময় শুধু-হাতে কার কাছে মড়া ফেলার খরচ ভিক্ষে করতে যাবি বল্ ত?—আমি বলছি, ও দু'গাছা সেই জন্যে থাক্—।"

নমিতা বুঝিল ইহাই যথেষ্ট!—ঘাড় হেঁট করিয়া সে ক্ষণেক নীরব রহিল; তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হাসির ছলে মনের বেদনা ঢাকা দিয়া বলিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে এত দিন এত অসুবিধে যখন আপনি কেটে গেছে, তখন এ-ক্ষেত্রেও তাই হবে।—আচ্ছা অত চেষ্টায় রইলুম।"

ঝাড়ন হাতে করিয়া নমিতা সুশীলের সহিত ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ডাক্তার মিত্তিরের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ? আচ্ছা, তিনি কি ছেলেটির কথা বল্‌বার জন্যে তোমায় ডেকেছেন?"

নমিতা বলিল, "অসম্ভব। ছেলেটি আমাদের বাড়ীতে আছে, তা তো তাঁরা কেউ জানেন না। তেওয়ারীকে বারণ করা হয়েছে।

সে ভদ্রলোক এ কথা নিয়ে কখনই হৈ চৈ করবে না, এটা ঠিক।"

সুশীল উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু ও-বেলা, সে বিছানা ছেড়ে একা বাইরের ঘরে গিয়েছিল। নিখিলবাবু তাকে দেখ্‌তে পেয়ে সব জিজ্ঞাসা করলেন যে!"

নমিতা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সমিতা বলিল, "ডাক্তারবাবুর স্ত্রী যদি কিছু জিজ্ঞাসা করেন, কি বল্‌বে?"

অল্পকাল নীরব থাকিয়া নমিতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ক্ষেত্রে ত্রাহ্যঃ দ্বিতীয়ন্তে।" দেখা যাক্, দরকার হয়, সত্যকে চেপে যাব; কিন্তু মিথ্যে দিয়ে তাকে বিরত কর্ব্বো না, এটা নিশ্চয়। বেরিয়ে যখন পড়েছি, তখন এগিয়ে যাওয়াই ঠিক।" (সুশীলের প্রতি) "আয় সিসিল!"—(সমিতার প্রতি) ওরে মেলুন, বেলা চারটের সময় ছেলেটিকে এক দাগ ওষুধ খাওয়াস্, তার পর ঠিক্ ছ'টায়!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের পরলোকগমনে

শোকোচ্ছ্বাস।

এ কি শুনি অকস্মাৎ,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,—
নাহি মম কাকাবাবু স্নেহ-পারাবার,
নাহি ব্যথিতের আর স্থান জুড়াবার!

আজ দুই মাস গত,
নূতন মণি অবিরত,
কাঁদেন সদাই পড়ে ভূমিতে লুটিয়া,
তাঁহার যে কত কষ্ট দেখনা চাহিয়া॥

পুত্র-শোকে ভাঙ্গা বুক,
চাহিয়া তোমার মুখ,
সংসারের একধারে আছেন বসিয়া,
উচিত হ'ল না যাওয়া তাঁহারে ফেলিয়া॥

'ধ্রুব'-হারা হ'য়ে শোকে,
বড় বেজেছিলা বুকে,
তাই কি চলিলে দেব, পুত্র-সম্ভাষণে,
যেখানে বিচ্ছেদ নাই অনন্ত মিলনে!

বধূটী বাপের বাড়ী,
যাইলে তাহারে ছাড়ি,
কখন ও থাকিতে দেব, পার নিকো হায়,
কন্যা-সমা পালিতেন স্নেহ মমতায়॥

কত স্নেহ সবাকারে,
ছিল যে তব অন্তরে,
এমন মমতা দেব কিছু না রাখিলে,
ব্যথা দিতে সবাকারে ব্যথিত না হলে॥

যাইলে তোমার কাছে,
যেন কত তৃপ্তি আছে,
আয় মা "সুমনি" এলি আয় মাতা আয়,
বলিতে আদর করে স্নেহ মমতায়!

তোমার স্নেহের ডোরে,
বেঁধেছিলে সবাকারে,
শত্রু মিত্র সবে মিলে তব গুণ গায়,
আত্মীয় স্বজনগণ করে হায় হায়!

জ্ঞান-কর্ম্মে অনুত্তম,
আর নিষ্ঠা তব সম,
কে জানে শাসন হায় এমন করিয়া,
ভক্তি প্রীতি ন্যায় শান্তি দয়া স্নেহ দিয়া ?
সারাটী জীবনে আর—
দেখা কি দিবে না আর ?
অক্রূরের গৌরব-রবি চলিলে কোথায় ?
চেয়ে দেখ, সবে মিলে ডাকিছে তোমায়।

হে প্রভু মঙ্গলময়,
তুমি যে করুণাময়,
কি মঙ্গল সাধিবারে লইলে তাঁহারে,
দাও দেব বুঝাইয়া আমা সবাকারে ॥

দুঃখিনী কন্যা সুহাসিনী

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিংশ অধ্যায় পশুপক্ষি-প্রতিপালন।

মানব সৃষ্টির রাজা। জগতের পশুপক্ষিগণের উপরেও ইহার প্রভুত্ব। দুর্দ্দান্ত মত্ত মাতঙ্গকে মানব স্বীয় আজ্ঞার অধীন করিতে পারে। মানব, কখনও আপনার কার্য্যসাধনের জন্য, কখনও বা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, কখনও স্নেহ বা কপট মোহে অভিভূত হইয়া, কখনও বা ভক্ষনার্থ, কদাচিৎ বা আপনাদিগের সুখের সহিত ইহাদিগের সুখাসুখ চিন্তা করিয়া আপনার সুখের আদর্শে ইহাদিগকে সুখী করিবার জন্য, কখনও বা সন্তান-সন্ততির মনস্তুষ্টির অভিপ্রায়ে, কখনও বা খগীর কণ্ঠে হরিনাম স্রবণের আশায়, কখনও বা অপত্য-স্নেহের আধার প্রাপ্ত হইয়া অপত্যহীনতা দূরীকরণ মানসে এবং কখনও বা সম্পূর্ণ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া, অসীম আকাশতলে বা বিস্তীর্ণ ধরাধামে স্বাধীনতার সুখ বায়ুতে বিচরণশীল পশুপক্ষিগণকে নিরুপদ্রব স্থানে রক্ষা করেন, বা পিঞ্জরে আবদ্ধ করেন এবং আহার, পানীয় প্রভৃতি প্রদান করেন। কিন্তু যে দিন দেহ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া পশুপক্ষীর জীবনবায়ু অসীম বায়ুমণ্ডলীতে মিশিয়া যায়, সে-দিন সেই মানব প্রেমের ক্ষুদ্রগণ্ডী সেই স্থানটী বা সেই পিঞ্জর সেই পালিত জীবের শূন্য দেহপিঞ্জর লইয়া বসিয়া থাকে! পশু পক্ষী প্রভৃতি পালনের জন্য তাহাদিগের জীবন-বিষয়ে মানবের জ্ঞান থাকা উচিত। এইজন্য কয়েকটী গৃহপালিত পশুপক্ষীর বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।

খরগোস:—খরগোস পালন করিতে হইলে টোং তৈয়ার করা উচিত। খরগোসদিগের শরীর সাধারণতঃ মোটা, কিন্তু একবার পীড়িত হইলে ইহারা আর বাঁচে না। সুতরাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যের জন্য শুষ্ক স্থানের প্রয়োজন। যে-স্থানে বারিপাত হয়, অথবা যেস্থানে সহজেই শৈত্য লাগিতে পারে, তাদৃশ স্থানে পরিহর্ত্তব্য। খরগোসের

পূর্বে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। প্রস্রাবই এই দুর্গন্ধের কারণ। সুতরাং তাহাদিগের খুব্ রিতে যথেষ্ট পরিমাণে শুষ্ক মৃত্তিকা রাখিয়া দেওয়া উচিত। দুর্গন্ধ বাহির হইলেই সেই মৃত্তিকাকে ফেলিয়া দিয়া নূতন মৃত্তিকা দিবে।

খরগোসের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে প্রতি ছয়টী খরগোসীর জন্য একটি করিয়া খরগোস রাখা উচিত। নতুবা ত্রিশটী খরগোসীর পক্ষে একটী খরগোস যথেষ্ট। প্রত্যেক খরগোসীর জন্য দুইটী করিয়া কামরা রাখা বুদ্ধিমানের কার্য্য। এক সঙ্গে সকলকে রাখিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। খরগোস-মাত্রেই খরগোসীকে বড়ই বিরক্ত করে এবং শাবক হইলে মারিয়া ফেলে। খরগোসেরা সাধারণতঃ ৬ হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে; তন্মধ্যে পুং-জাতীয় খরগোস ১ হইতে ৫ বৎসর এবং স্ত্রীজাতীয় খরগোসেরা ৮ মাস হইতে ৫ বৎসর জীবিত থাকে। খরগোসী আটের অনধিক সন্তান প্রসব করে। আট মাসের না হইলে শাবকগণকে খরগোসের নিকট যাইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তদ্দ্বারা দুর্ব্বল সন্তান জন্মে। যে সকল সন্তান চৈত্র মাসে জন্মে তাহাদিগকে অগ্রহায়ণ মাসে খরগোসের নিকট যাইতে দিবে। খরগোসী সন্তানের সহিত ত্রিশ দিন থাকে। তৎপূর্ব্বে তাহাকে খরগোসের নিকট পাঠাইবে না। সন্তান জন্মের ১৫ দিন পরেই খরগোসী সুস্থ হয়। কিন্তু আরও ১৫ দিন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

খরগোসীর গৃহের উপর পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখিবে যে কে কবে সন্তান প্রসব করিবে। প্রসবের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে গৃহটীকে বিশেষরূপে পরিষ্কৃত করিয়া খড় বিছাইয়া রাখিবে। খরগোসী স্বীয় বক্ষের লোম ছিঁড়িয়া ও খড় লইয়া সন্তানের আবাস নির্ম্মাণ করে। খরগোসীকে শান্ত রাখিবে ও রীতিমত আহার দিবে। এই সময়ে যদি যত্ন না হয়, তবে খরগোসীর দুগ্ধ রোধ হইবার এবং সন্তানের মৃত্যুর সম্ভাবনা।

খরগোসী সন্তান প্রসব করিলে ১৫ দিন পর্য্যন্ত যেন সন্তানকে স্পর্শ করিও না। কারণ, স্পর্শ করিলে অথবা বাসা খুলিলে খরগোসী সকল সন্তানগুলিকে বধ করে। যদি আর্দ্রতার ভয় থাকে, তবে নবজাত সন্তানগুলিকে শুষ্ক কোণে লইয়া যাইবে, কিন্তু যদি সমস্ত বাসাটা শুষ্ক হয়, তবে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়াই উচিত। যদি খরগোসী দ্বিতীয়বার সন্তান খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে বধ করিয়া ভক্ষণ করাই বিধি।

খরগোস শিশু জন্মিবার কালে অন্ধ থাকে; কিন্তু পঞ্চম দিবসে তাহাদিগের চক্ষু ফুটে। সন্তানগণ ১৫ দিনের হইলে তাহাদিগকে খাইতে শিখাইবার জন্য বাসা হইতে বাহিরের কামরায় তাড়াইয়া দিবে। যদি ইতঃপূর্ব্বে তাহারা বাহিরের কামরায় আসে, তবে উক্ত উপায়ের আবশ্যক হয় না; কারণ, তখন তাহারা স্বেচ্ছায় বাহিরে আসিবে।

জন্ম দিবস হইতে একমাস অতিক্রান্ত হইলে, যখন তাহারা উত্তমরূপে খাইতে শিখে তখন তাহাদিগকে মায়ের নিকট হইতে দূরে রাখিবে; নতুবা তাহারা তাহাকে অস্থিচর্ম্ম সার করিবে। যে সকল খরগোস-শিশু তিন মাসের নহে, তাহাদিগকে অন্য কামরায় রাখিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিতে দিবে। ঘাস পড়িয়া

থাকিলে, সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য তাহাদিগকে খাইতে দিবে না; প্রত্যেক দিন তাজা খাদ্য খাইতে দেওয়াই বিধি। চারি মাসের হইলে শিশুগুলিকে তাহাদিগের জ্যেষ্ঠের সহিত রাখিতে পার, কিন্তু এরূপ করিবার পূর্ব্বে পুংখরগোসগুলিকে অগ্রে কাটিয়া ফেলিবে। ছয় মাসের হইলে বলবান খরগোসগুলিকে সন্তান জননের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাদিগকে দূরে রাখিবে এবং উপযুক্ত সময়ে পুং খরগোসের নিকট পাঠাইবে। পুং খরগোস শিশুগুলিকে ৫ মাস বয়সেই দূরে রাখা উচিত।

* * *

খরগোসদিগকে একবার প্রাতঃকালে ও একবার সন্ধ্যাকালে খাইতে দিবে। এতদতিরিক্ত খাওয়াইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। পেট ভরিয়া দুইবেলা খাইতে দেওয়া বরং ভাল, তথাপি অল্প অল্প করিয়া সারাদিন খাওয়ান উচিত নহে। কোমল বৃক্ষ, শাখা পল্লবাদি খরগোসের উত্তম খাদ্য; কেবল মাত্র Geranium তাহারা খাইতে ভালবাসে না। যাহাদিগের উদ্যান আছে, তাহাদিগের খরগোস পুষিতে অতি সামান্য খরচ পড়ে।

বর্ষাকালে বা মেঘলা দিনে কাঁচা খাদ্য না দিয়া শুষ্ক খাদ্য দিবে। গ্রীষ্মকালে শাকশবজির সহিত ছোলা মিশ্রিত করিয়া একবেলা, বিশেষতঃ গর্ভিনী খরগোসীকে দিবে। এরূপ করিলে পুষ্ট ও বলবান সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রচুর পরিমাণে তাজা খাদ্য দেওয়াই বিধি; পর্য্যুসিত খাদ্য নিষিদ্ধ। একই প্রকার বস্তু খাইতে না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আহার দেওয়া উত্তম। ৯০টী খরগোস শতকরা শৈত্য বা অন্য রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। শীতকালের জন্য ঘাস, জেরুজিলম আর্টিচোক, সালগম, মটর, সিম, ছোলা চোকর প্রভৃতি আহরণ করিয়া রাখিবে। যে সকল খরগোসীর সন্তান হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদিগকে উত্তমরূপে খাওয়াইবে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, খরগোস জলপান করে না। ইহা ভ্রম মাত্র। অন্যের পক্ষে যেমন জলের আবশ্যকতা খরগোসের পক্ষেও তাহাই। প্রসূতা খরগোসীর পক্ষে জলের অধিক আবশ্যক। কাঁচা খাদ্য জলের আবশ্যকতা হ্রাস করিয়া থাকে।

খরগোসকে বধ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে সুগন্ধ গাছ-গাছড়া তাহাকে খাওয়াইলে তাহার মাংস অধিকতর সুস্বাদু হয়।

খরগোসগুলিকে যত্নে রাখিলে তাহাদের রোগ হইতে পায় না। রোগ হইলে আরোগ্য করা অপেক্ষা, রোগকে বাধা দিবার চেষ্টা করা উচিত। খরগোসশিশুদিগের প্রায়ই চক্ষু উঠিয়া থাকে। অপরিচ্ছন্নতাই উক্ত রোগের কারণ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, নর্দ্দামার সাফাই, এবং স্থান পরিবর্ত্তন উক্ত রোগের প্রতিকার জানিবে।

যকৃতের রোগ অথবা উদরী খরগোসের প্রাণহা হইয়া থাকে। এ রোগের প্রতিকার করিতে যাওয়া বৃথা। হনন করাই প্রকৃষ্ট উপায় জানিবে।

খরগোসকে ধারণ করিতে হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কর্ণ ধারণ করিয়া, বাম হস্তের উপর তাহাকে চিৎ করিয়া ধারণ করাই উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে ধারণ করিলে খরগোসের হানি হইতে পারে। প্রসূতা খরগোসীর বিশেষ যত্ন করিবে।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

পুস্তক সমালোচনা।

জীবন-সংগ্রাম—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। বাঁধাই সুন্দর। উপরে সুবর্ণাক্ষরে গ্রন্থের নাম অঙ্কিত আছে। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি দেশপূজ্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

গ্রন্থকার পরিচিত প্রবীণ সাহিত্যিক। তাঁহার 'পদ্যসার' 'সাহিত্যমঞ্জরী' প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠ্য এবং 'ঘরের কথা' প্রভৃতি গৃহপাঠ্য অনেকগুলি পুস্তক আছে। তিনি তাঁহার এই বার্দ্ধক্যনিপীড়িত, জরাজীর্ণ, রুগ্ন, ভগ্ন দেহে, দেশের দারিদ্র্য প্রভৃতি দুর্গতি নিবারণ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য, তাঁহার ৬৮ বৎসরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করিয়া উপন্যাসচ্ছলে এই উপদেশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা মূল্যবান। গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই ইহার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। দেশের আধুনিক অবস্থা প্রতিফলিত করিবার জন্য এবং পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য ইহাতে যথেষ্ট যত্ন করা হইয়াছে এবং অন্নসমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থকার গভীর গবেষণাও করিয়াছেন। কত প্রকার অজ্ঞানতা এখনও দেশবাসীর হৃদয় আবৃত করিয়া আছে, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কারণে জাতি-বৈরতার বিষম ফল এবং সাধুতা ও উদ্যমশীলতার পরস্পরের চিত্র অতিসুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের প্রধান চরিত্র ধীরোদাত্ত নরেন্দ্রনাথ, স্বার্থত্যাগী, বিদ্বান্, আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী, উদার, কর্ম্মবীর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরদুঃখকাতর, গম্ভীরপ্রকৃতি ও ঈশ্বরে ভক্তিমান; সুতরাং, আদর্শ-স্থানীয়। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়, হৃদয়ে বল হয়, এবং ঈশ্বরপ্রীতি বর্দ্ধিত হয়। ইহার ভাষা অতিশয় সরল। সকলেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅধিনীশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 647. July, 1917.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪৭ সংখ্যা। | আষাঢ়, ১৩২৪। জুলাই, ১৯১৭। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

আসাতে—

তোমায় আমায় মিলন হ'ল
আজ্‌কে যখন, নাথ,
তখন গভীর রাত!
সাঁঝের বেলাই আস্‌বে তুমি
আমার এই ঘরে,
ছিলাম আশা ভরে।
জ্বালিয়েছিলাম গন্ধ-প্রদীপ
ধূপের সুরভি
অস্ত গেলেই রবি!
হাজার কানন ঘুরে ঘুরে
তুলেছিলাম ডালা,
গেঁথেছিলাম মালা!
পেতেছিলাম শয়ন যেথা
দখিন বাতাসে
মাতায় সুবাসে।

ক্রমে আঁধার ঘনিয়ে এল,
গভীর হ'ল রাত,
কোথায় তুমি, নাথ!
মিলিয়ে গেল সুখের হাসি
অধর-কোণে মোর,—
নয়ন জলে ভোর!
কত আশায় যত্নে পাতা—
কোমল শয়নখানি
দূরে ফেলে টানি,
দ্বারের কোণে আঁচল পাতি
ঘুমে আছি ঢ'লে,
তখন তুমি এলে!
নিভে গেছে গন্ধ-প্রদীপ
সন্ধ্যা-বেলায় জ্বালা,—
শুকনো ফুলের মালা!

বেসুর আমার বাজ্‌ল বীণা,
কণ্ঠে নাইকো তান,—
শুন্‌তে চাইলে গান!
কোথায় তোমায় বস্‌তে দিব—
আসন কোথা পড়ে?
আমার আঁচল 'পরে
মাটীর উপর লুটায় যেথা—
ঈষৎ মধুর হেসে
বস্‌লে, নাথ, এসে!

নয়ন-তারায় তারায় যত
প্রেমের আলো জ্বেলে
প্রেমিক! দিলে ঢেলে
আঁধার হৃদয়-গহন-মাঝে,
নিয়ে বীণাখান
শুনাইলে গান!
দুঃখ-ব্যথা মিলিয়ে গেল,
ভরে আমার বুক
তৃপ্তি এল, শান্তি এল, সুখ!

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশী-ধামের পবিত্র দৃশ্য সন্দর্শন-মানসে একটি ক্ষুদ্র তরণী ভাড়া করিলাম! কর্ণধার একজন বৃদ্ধ। তাহার পূর্ব্ব-পুরুষগণও এবম্প্রকার নৌকা-চালনা করিয়া অনেকানেক অপরিচিতের দর্শন-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। কর্ণধার নিজ হইতেই প্রসঙ্গাদি সহ তীরবর্ত্তী প্রাচীন অট্টালিকা, দেবমন্দির, স্নানের ঘাট, ইত্যাদি দেখাইয়া চলিল।

গঙ্গাগর্ভ হইতে বহু উর্দ্ধে পবিত্র বারাণসী-ধাম। বরুণা ও অসীর সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়া ইহার এতাদৃশ নামকরণ। স্রোতের বিপরীত দিকে আমাদের ক্ষুদ্র তরণীখানি তীরের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। কিয়দ্দূর ব্যবধানে এক-একটি স্নানের ঘাট। তাহার সুদৃঢ় প্রস্তর-সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া কত শত নরনারী গঙ্গায় অবতরণ করিতেছে। অদূরে গঙ্গাগর্ভে এক-একটি শুভ্র প্রস্তর-মন্দির;—অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে গঙ্গাজল কুণ্ডলীকৃত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তর ধৌত করিয়া দিতেছে!—তথায় কেহ কেহ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন,—কেহ বা তার-স্বরে পবিত্র মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। স্নানের ঘাটে তিল ধারণের স্থান নাই! কোথাও কেহ অর্দ্ধনিমজ্জিতাবস্থায় নিমীলিতনেত্রে যুক্তকরে দণ্ডায়মান, কেহ বা নিরক্ষর পাণ্ডার উচ্চারিত মন্ত্র পুনরাবৃত্তি করিয়া গঙ্গার জলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। গঙ্গাবক্ষে পুষ্প-বিল্বপত্রাদি প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইতেছে, আবার স্রোতের টানে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে! গঙ্গার কল্লোল নাই—শব্দ নাই! ব্যস্ততা-সহকারে নিঃশব্দে সে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুনৃপতি-নির্ম্মিত এক-

একটি রম্য হর্ম্ম্য গঙ্গাগর্ভ হইতে বহু উর্দ্ধে শির তুলিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!—তাহাদের দৃঢ়তা এবং স্থাপত্য সমধিক প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে পুরাতন প্রস্তর প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া গঙ্গাগর্ভে চিরশান্তি লাভ করিতেছে এবং অপরাংশ পতনোন্মুখ হইয়া নৌযাত্রীদিগের ভীতি উৎপাদন করিতেছে;—বুঝি বা, সঙ্গীর নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে! কোথাও বা অতিপ্রাচীন একটি নিম্ব-বৃক্ষ সমূলোৎপাটিত হইয়া নদী-পুলিনে পড়িয়া রহিয়াছে,—কোনও মতেই গঙ্গাগর্ভে যাইতে পারিতেছে না,—বোধ হয়, এখনও তাহার সময় হয় নাই। দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে বাস করিয়াও অন্তিমে গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল না, তাই বুঝি, ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া সে ধূলায় লুটাইতেছে! কোথাও বা গঙ্গা দুই একটি জীর্ণ শীর্ণ আবাসের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগকে অভয়প্রদান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ যে দৃশ্য উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহা অভাব বিস্ময়কর! কাশীধামে দেহত্যাগ হইলে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়, এই ধারণা হিন্দুর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তাই কত বৃদ্ধ অন্তিমে শিবত্ব-কামনায় কত কাল ধরিয়া কাশীবাস করিতেছেন—কত সাধের পুত্র-পৌত্রকে জন্মের তরে বিদায় দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, কত সাধের অট্টালিকা, ধন-সম্পত্তি, ভোগবিলাস সমুদয় পশ্চাতে ফেলিয়া মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহা ভাবিতেও প্রাণে কষ্ট হয়। এ প্রলোভন ত সামান্য নয়! আজন্ম কঠোর সাধনায়ও ত এই ফল লাভ হয় না! হৃদয়ের কি অসীম বল, কি অটল বিশ্বাস! দেখিলাম, প্রস্তরময় মহাশ্মশানের তিনদিকে প্রবাহিতা উদার-গঙ্গা নিমেষ-মধ্যে চিতাভস্ম কোথায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে! এ স্থানে মানবের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই শ্মশানের দৃশ্য সন্দর্শনে প্রণয়িনীর মর্ম্মভেদী হাহাকার, জননীর সকরুণ বিলাপ, পুত্রের গভীর শোকোচ্ছ্বাস, কিছুই মনে পড়ে না; প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয় না,—জীবন-মরণের কিছুই পার্থক্য অনুভূত হয় না!—যেন সব ভুলিয়া যাইতে হয়! কোথা হইতে অনির্ব্বচনীয় ভাবনারাশি আসিয়া প্রাণের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, সমস্ত বেদনা দূর করিয়া দেয়!

যে শ্মশানে জীবের সমস্ত শেষ হইয়া যায়,—মান-মর্য্যাদা, অভিমান-অহঙ্কার, সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়,—এমন কি পার্থিব যাহা কিছু, সমুদায় ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেই শ্মশানে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে প্রাণে স্বতঃই একটা অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা জন্মে! মনে হয়, হায় জীব, কোথায় তোমার সুখ-দুঃখানুভূতি! এই সুকোমল দেহে অগ্নি-সংযোগ করিল, আর তুমি নীরবে তাহা সহ্য করিয়া রহিলে! তোমার আদেশে কত লোক কত কঠোরভাবে প্রপীড়িত হইত, কি প্রভূত ক্ষমতা তোমার ছিল!—তোমার অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া কত শত লোক তোমার দ্বারদেশে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিত,—তোমার ভ্রূ-কুটিতে কত জনের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হইত, তোমার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে কত অসাধ্য কার্য্য সাধিত হইত! আর আজ তোমার এই পরিণাম! কত জন ভাবিত, তুমি বিধাতার এক সুন্দর সৃষ্টি, আর আজ তাহা

ভস্মীভূত হইয়া গেল! আজ তোমার ও পথের ভিখারীর একই পরিণাম!

কিন্তু মহাশ্মশানের উদার উন্মুক্ত দৃশ্যে প্রাণ-মন বিস্ময়-বিজড়িত হইয়া যায়! মনে হয়, যেন সব সত্য। মহাশ্মশানের পার্শ্বদেশে চণ্ডালগণ অপূর্ব্বরূপে সংসার রচনা করিয়া মনের সুখে কালযাপন করিতেছে। তাহারা নির্ব্বিকার-চিত্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে। প্রলয়ের পাশাপাশি সৃষ্টির সূচনা অতীব বিস্ময়ব্যঞ্জক। পুত্র-

দশাশ্বমেধ-ঘাটে আসিয়া কর্ণধারকে বিদায় দিলাম। ঘাটের উপর লোকে লোকারণ্য। বহুকষ্টেও দাঁড়াইবার স্থান পাইলাম না। অগত্যা অদূরবর্ত্তিনী বৈকতভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পবিত্র মন্ত্র-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত হইতেছিল। গঙ্গায় অর্দ্ধনিমজ্জিত যাত্রিকুলের বাহুৎক্ষেপ-সঞ্জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চঞ্চল বীচিমালা সৌর-করে ঝক্‌মক্ করিতেছিল। তথায় যেন কি মহান্ এক পুণ্য-প্রভাব চির-বিকশিত। সংসারের সীমাবদ্ধ সুখ-দুঃখ,

কাশীর মহাশ্মশান।

শোকাতুরা জননী হইতে তাহারা অপত্য-স্নেহ শিক্ষা করিতেছে, দুঃখ হইতে তাহারা সুখের কল্পনা করিয়া লইতেছে। গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ মহাশ্মশানের দিকে বহুক্ষণ ধরিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বহুদূরে চলিয়া আসিলাম। ধীরে ধীরে শ্মশানের প্রস্তর-স্তম্ভ-গুলি দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল। সম্মুখ দিয়া গঙ্গা প্রবল-বেগে চলিয়া যাইতেছিল। আমি ভাবিলাম, এমনই করিয়া সংসারের সকলই চলিয়া যাইবে,—কেহ কাহারও অপেক্ষা করিবে না।

মায়া-মমতা নিমেষে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবগাহনে ভক্তের ব্যাকুলতা, বৃদ্ধার আত্মপ্রসাদ, ব্যথিতের তৃপ্তি, চিরদুঃখীর দুঃখ-ভ্রান্তি পরিস্ফুট হইতেছে। সকলেই অপার্থিব যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। ভাবিলাম, এইজন্যই মায়ের নাম সন্তাপহারিণী।

মণিকর্ণিকার ঘাটটীও ঠিক্ দশাশ্বমেধ-ঘাটের ন্যায়,—আকৃতিগত বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। ঘাটের নিকটে লৌহবেষ্টনী-পরিবৃত মণিকর্ণিকা-কুণ্ড। তাহাতে যাত্রিগণ সর্ব্বপ্রথমে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হয়। নাতিবৃহৎ কুণ্ডে

অসংখ্য লোক স্নান করিতেছে,—বিরাম নাই! এজন্য জল কর্দ্দমাক্ত। অসীঘাট, কেদারঘাট, প্রভৃতি আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ঘাট আছে, তাহাতে সর্ব্বদাই লোকের ভিড়।

স্বর্গীয় মহাত্মা ভাস্করানন্দস্বামীর আশ্রম সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল মহাত্মার দেহ-ত্যাগ হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি যেন তিনি আশ্রমে সশরীরেই বিরাজমান। মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত ভূবর্ণ-ধবল একটি মন্দির; তাহার চারিদিকে বৃক্ষবাজি। মন্দিরে মহাত্মার প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; তথায় প্রতিদিন মহাত্মার আরতি ও পূজা আরাধনা সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানটির নাম আনন্দবাগ। মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে মহাত্মার ব্যবহৃত পুস্তক, পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি অতিযত্নে সুরক্ষিত। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে জীর্ণ একটি দ্বিতল ইষ্টকালয়; তাহাতে মহাত্মা ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন।—আরোহণের সোপান-গুলি স্থানে স্থানে ভগ্ন এবং জঞ্জালাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কাহারও উপরে উঠিবার অধিকার নাই। এ-দিক্ ও-দিক্ ঘুরিয়া দেখিলাম, স্বচ্ছন্দজাত পুষ্পবৃক্ষাদি বিশৃঙ্খলভাবে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে! কোনটি অতিস্থবির এবং স্বীয় জীর্ণ শীর্ণ দেহের ভার রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গুল্মের উপর হেলিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু তাহার নিম্ন দেশ অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; যেন কেহ সম্মার্জ্জনী-দ্বারা সদ্যঃ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বত্র নীরবতা, নিস্পন্দতা,—একটি বৃক্ষ-পত্রের পতন শব্দও শ্রুতিগোচর হয় না! যেন কেহ পরোক্ষে থাকিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন! মন্দিরের একপ্রান্তে অনেক ক্ষণ বসিয়া রহিলাম। সুশীতল আনন্দবাগ কি শান্তিপূর্ণ এবং গম্ভীর! জ্বালাময় সংসারের পাপ-তাপ এস্থানে আসিতে পারে না।

আনন্দবাগের অনতিদূরেই দুর্গাবাড়ী। এই দেবতাগৃহ বহু-প্রাচীন। ইহার পার্শ্বে একটী নাতিবৃহৎ দীর্ঘিকা;—প্রাঙ্গণে স্থবির বৃক্ষরাজি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। অগণিত শাখামৃগ দলে-দলে আসিয়া আগন্তুকের ত্রাস উৎপাদন করিতেছে! তাহাদিগের অত্যাচার অত্যন্ত অধিক। ছোলাভাজা বা অন্য প্রকার খাদ্য তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে উপঢৌকন প্রদান না করিলে, সে-স্থান হইতে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন একপ্রকার অসম্ভব। তাহারা আগন্তুককে নানাপ্রকারে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং গমনের ক্ষিপ্রতা অতীব প্রশংসনীয়।

অদূরে নিবিড় অরণ্যানী-পরিবেষ্টিত শঙ্কটমোচন শিবের মন্দির। ইহা যেন একটী মুনির পবিত্র আশ্রম। বৃক্ষরাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া স্থানটীর গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে; শ্যামশষ্প ও তৃণগুল্ম তরুরাজির পাদদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছে,—সর্ব্বত্রই এক স্নিগ্ধ ভাব চির-বিরাজমান। ফলভারাবনত বিটপী-শ্রেণী মন্দিরটীকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে;—প্রচণ্ড তপনের প্রখরতা তথায় অনুভূত হয় না;—মৃদু মারুত-হিল্লোলে তাপিত দেহ-মন শীতল হইয়া যায়!

প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পথিমধ্যে সেণ্ট্রাল হিন্দু কালেজ ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস দেখিয়া আসিলাম। বহুদূর-বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, গগনস্পর্শী

অট্টালিকা ছাপয়িত্রীর প্রশান্ত হৃদয়ের পরিচায়ক। ছাত্রাবাসের প্রবেশদ্বারের উপরে বীণাপাণির পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সুরক্ষিত। প্রাঙ্গণে কুমুদ-কল্হার-পরিশোভিত সুবৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়ে নানাবর্ণের বিচিত্র মৎস্য নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল; ফোয়ারা হইতে সহস্র ধারায় সলিলরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সুশীতল শান্তি বর্ষণ করিতেছিল।

কাশীধামে অবস্থানকালে সংসারের তীব্র যাতনা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সুকৃতির ফলে কিয়দ্দিবসের জন্য দেবদুর্লভ এক শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়াছিলাম। এ স্থানের সব নিত্য, সব সুন্দর—সব স্নিগ্ধ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বৈরাগ্য।

(অপ্রকাশিত "বৈশাখী" হইতে।)

আমার গর্ব্বিত মন! হয়ো না চঞ্চল,
আপন গৌরবে কভু হইয়া বিহ্বল।
কে তুমি, এসেছ কেন, যাইবে কোথায়?—
কভু কি ভেবেছ মনে নিজনে ঊষায়?
"আমার" "আমার" কর, কি রহে তোমার?
ভেবেছ কি কভু তুমি, তুমি যে কাহার?

জীবনে রহিবে যদি তব অধিকার,
বিপদে কেন বা বল, "কি হবে আমার?"
কেন বা রাখিতে নার প্রাণ-প্রিয়জন,
যা'রে বিনা অন্ধকার নিরখ ভুবন?
কেন বা সৃজিতে নার যা' ভাব যখন,
কেন বা অভাবে কর হতাশে রোদন?

যে তুমি তোমারে ভাব মহাগরীয়ান্,
সেই তুমি হও ভবে ধূলির সমান!
নিয়ত দলিত হও ভবাঘাতে কত,
তোমার উন্নত শির হয় ক্ষণে নত!
তোমার সকল দর্প নিমেষে ফুরায়,
তথাপি গৌরব কর, নাহি লাজ তায়?

তুমি যে আলেয়া হও, নিশার স্বপন,
তুমি যে চপলা-প্রায়, ক্ষণিক তেমন:
তুমি পত্রে ধারা-সম হও যে ধরায়,
ফুৎকারে উড়িয়া যাও নিমেষে কোথায়!
তুমি হও দীপ-সম সহসা নির্ব্বাণ,
'রাখ নিজে' নহ তুমি হেন বলীয়ান্।

ওরে মন! যাও ভুলে "আমার" "আমার",
কিছুই তোমার নাহি, যা' হের ধরার।
এ দেহ জীবন মন যাহা সমুদয়
লভিয়াছ,—"উপহার"; কিছু নিজ নয়।
তুমি যে 'যাত্রিক' হও অনন্ত পথের,
জান না ঠিকানা আজো আপন ঘরের!

ক্ষণেক নির্ব্বাক্ হয়ে ভাব আপনায়,—
"কে তুমি, এসেছ কেন, যাইবে কোথায়?"
এ জীবন খেলা নহে, তপস্যা-প্রধান,
এসেছি পশরা শিরে করিতে প্রদান।
বিনিময়ে যেতে হবে লয়ে "সার ধন",
তবেই গৌরব তব, সার্থক জীবন!

স্বর্গীয়া হেমন্তবালা দত্ত।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৪)

মাতার নিকট হইতে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিলেও, রাস্তায় নামিতেই কিন্তু নমিতার মুখের সেই হাসি মিলাইয়া গেল। সাংসারিক অর্থকৃচ্ছ্রতার জটিল সমস্যাটা যে, কোনও উপায়ে সুমীমাংসিত হইবে, তাহার কোনই নির্দ্দেশ নমিতা খুঁজিয়া পাইল না। মাতার কাছে কুলী বিক্রয়ের প্রস্তাব তুলিয়া, তাঁহাকে আঘাত দিতে যাইবার পূর্ব্বে, তাহাকে নিজের হৃদয়কেও অনেকখানি আঘাত দিয়া সতর্ক ও সাহসী করিয়া লইতে হইয়াছিল ; নচেৎ এ প্রস্তাব উল্লেখের কুণ্ঠাটুকু কাটানই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। তাহার সব চেয়ে বেশী সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল এইজন্য যে, কুলী-দুই-গাছা তাহার নিজের নহে ;—উহা চিরদিনই সমিতার নিজের সম্পদ্ বলিয়া গণ্য ছিল। কয়দিন পূর্ব্বে হঠাৎ অত্যন্ত পছন্দ হওয়ায় নমিতা উহা সমিতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া, নিজের চুড়িগুলা তাহাকে দান করিয়া দিয়াছে।

অবশ্য, নমিতার মত পছন্দ-জ্ঞানহীনা নির্ব্বোধের পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগর্হিত পর-দ্রব্য-লুব্ধতার মূলে যে একটুখানি ইতিহাস না ছিল, তাহা নহে ; কিন্তু নমিতা তাহা সকলের নিকট চাপিয়া গিয়াছিল। কারণ, প্রকাশ হইলে, উদ্দেশ্যটা ব্যর্থ হইত। ব্যাপারটা আর কিছুই নহে :—সে-দিন বৈকালে নিদ্রাভঙ্গের পর, পার্শ্বের ঘরে নির্জ্জন-বিশ্রম্ভালাপ-রত সুশীল ও সমিতার কথা কিছু কিছু তাহার কাণে ঢুকিয়াছিল। বিদ্যালয়ের মেয়েরা সমিতার রুক্ষ, ময়লা-ধরা কুলী-দুইগাছা মান্ধাতৃ-মহারাজের গুপ্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত বলিয়া, সে-দিন খুব কৌতুক-বিদ্রূপ করিয়া সমিতাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। সেই কথাই দুঃখের দুঃখী ছোট ভাইটির কাছে ব্যক্ত করিয়া সমিতা মনের ভার লাঘব করিতেছিল। সেই দুঃখ-কাহিনীর দুই-চারিটা টুক্‌রা আসিয়া সদ্যঃ-সুপ্তোত্থিতা নমিতার কাণে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু তখন কোন কথা না বলিয়া সে হাঁসপাতালে চলিয়া যায়। পরদিন সকালে বাড়ীতে সকলের সহিত 'চা' পান করিতে করিতে নমিতার হঠাৎ মনে পড়ে যে, তাহার হাতের চুড়িগুলা সম্প্রতি অত্যন্তই উপদ্রব-পরায়ণ হইয়াছে ; চুড়ির ঘ্যাঁস লাগিয়া তাহার প্রায়শঃ জামার কফের বোতাম ছিঁড়িয়া যায়।—তা ছাড়া, আকস্মিক ঝনৎকার-শব্দে নিদ্রিত রোগী-দের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং হাঁসপাতালের কাজে আরও নানারকম অসুবিধা হইতেছে··· ইত্যাদি। সুতরাং, তৎক্ষণাৎ চুড়িগুলা খুলিয়া ফেলিয়া সমিতার কুলী-দুইগাছার জন্য জরুর তাগাদা জানাইয়া বসে। হাঁসপাতালের কাজে যাহারা ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের পক্ষে হাতের চুড়ি ও মাথার সুদীর্ঘ চুল যে কতদূর বিড়ম্বনা-জনক, তাহা সে যথাযথ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিল এবং কাজের সুবিধার জন্য তাহার মাথার চুলগুলা যে সময় সময় ছাঁটিয়া ফেলিতে তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা

হয়, তাহাও জানাইতে ত্রুটি করিল না। চুলগুলার কথা অবশ্য খুব নিম্নস্বরে বলিল, কারণ, মাতা বাহিরের রোয়াকে বসিয়াছিলেন। পাছে তিনি শুনিতে পান, তাই সে ভয়টা বাঁচাইয়া—সে সন্তর্পণে নিজের মামলা শেষ করিল। করুণহৃদয়া সমিতা দুঃখ-ছলছল্ চক্ষু-দুইটী তুলিয়া অবাক্ হইয়া দিদির পানে চাহিয়া রহিল; তারপর দিদির সুবিধার সহায়তা করিবার জন্য বিনাবাক্যে নিজের রুলী-দুইগাছা খুলিয়া, সাবান ও ব্রুসে মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া দিদিকে দিল। বলা বাহুল্য, কাজেই দিদির চুড়িগুলিও নিজে পরিতে বাধ্য হইল।

মা এ সকল তুচ্ছ ব্যাপারে কিছু বলেন নাই। কয়দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়াছিল; কিন্তু আজ আবার সেই অত্যন্ত পছন্দের অলঙ্কার যখন অত্যন্ত অনাবশ্যক বলিয়া নমিতার মনে পড়িল, তখন সে সাহসে ভর করিয়া মাতার কাছে কথাটা তুলিতে গিয়াছিল, কিন্তু প্রস্তাব টিকিল না। সহজ পন্থাটা যত সহজে মস্তিষ্কে উদয় হইয়াছিল,—ততোধিক সহজেই তাহা মন হইতে অন্তর্হিত হইল। নূতন উপায় অন্বেষণে নমিতা নূতন দুর্ভাবনায় মনোযোগ দিল। কিন্তু দুর্ভাবনা যতই বাড়ান হউক্, উপায়ের চিহ্ন কোথাও নাই!

নমিতা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে, এমন সময় ও-দিকের পথ হইতে হাঁস-পাতালের মিস্ চার্ম্মিয়ান ডান-হাতে ছাতা ও বাঁ-হাতে পরিচ্ছদের পশ্চাদ্ভাগ গুটাইয়া ধরিয়া দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল নমস্কার করিলে, প্রসন্না আনন্দময়ী চার্ম্মিয়ানের তুষার-শুভ্র বদনমণ্ডলে উৎফুল্ল হাস্য অজস্র কৌতুকে উছলিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া সুশীলের হাত ধরিয়া একটু ঝাঁকানি দিয়া—"হালো লিটল মিটার্," বলিয়া তিনি সুশীল, সুশীলের মা, সুশীলের দিদি, দাদা, ছাগল-ছানা, কুকুর-বাচ্চা এবং অন্যান্য সকলের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল এক-নিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন। সপ্রতিভ সুশীল ঘাড়-মুখ নাড়িয়া, হাত ভাঙ্গা হিন্দী ও পা-ভাঙ্গা বাংলাকে কোনমতে জোড়াতাড়া দিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত সৌজন্য বাঁচাইয়া যথাযথ উত্তর দিল। স্বভাব-সিদ্ধ-কৌতুকোৎসারিত-হৃদয়া চার্ম্মিয়ান্ আজেবাজে মাথা-মুণ্ড নানাকথা কহিয়া, শেষে নমিতার মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "এত রৌদ্রে ভাইকে নিয়ে বেড়াতে চলেছ নাকি?"

নমিতা বলিল, "কতকটা তাই। ডাক্তার-মিত্রের বাড়ী যাচ্ছি।"—পাছে চার্ম্মিয়ান, 'কেন' 'কি বৃত্তান্ত' প্রশ্ন সুধাইয়া বসেন বলিয়া, পর-ক্ষণে নমিতা তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি এমন সময় বাড়ী গিয়েছিলে না-কি?"

স্নিগ্ধ চন্দ্ররশ্মির মত শান্ত মাধুর্য্যময়ী নমিতার পাশ ঘেঁসিয়া উগ্রদীপশিখার মত উজ্জ্বল সুন্দরী চার্ম্মিয়ান্ চলিতে চলিতে বলিলেন, "হাঁ, আমার আহার্য্য প্রস্তুতের দেরী ছিল ব'লে, তখন তাড়াতাড়ি হাঁসপাতালে চলে এসেছিলুম। এখন বেহারা গিয়ে খবর দিলে, তাই পনের মিনিটের জন্য তেওয়ারী কম্পাউ-ণ্ডারকে বসিয়ে রেখে এসেছি। তিনি সাহায্য না করলে এখন আসা ঘটে উ'ত।—লোকটি বড় ভদ্র, বড় সহৃদয়!

নমিতা কোন উত্তর দিল না। তেওয়ারী

কম্পাউণ্ডারের নামটা সুশীলের কাণে পৌঁছিয়াছিল; সে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইয়া আগ্রহোন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তেওয়ারী—কম্পাউণ্ডার? হেড্ কম্পাউণ্ডার?—তিনি আছেন হাসপাতালে?—এখন আছেন?"

চার্ম্মিয়ান্ বলিলেন, "আছেন। হাঁ ভাল কথা, কৈ সিসিল, তুমি এখন তাঁর কাছে সিরাপ খেতে যাও না?"—

নমিতার পানে চাহিয়া সুশীল সঙ্কুচিত হইল। এমন গুপ্ত রহস্যটা দিদির কর্ণগোচর করা তাহার ইচ্ছা ছিল না;—এমন কি, এইজন্য সে সুরসুন্দরকেও পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়া রাখিয়াছিল।

সমুদ্রপ্রসাদ কম্পাউণ্ডার ছেলেমানুষীটা খুব ভালবাসে। সে-ই সর্ব্বপ্রথমে সুশীলের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া, সিরাপের মিষ্টস্বরবতের সাহায্যে কিশোর বন্ধুটিকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সুরসুন্দরের সহিত আলাপ হওয়ার পর হইতে সুশীল এখন সমুদ্রপ্রসাদের খোঁজ-খবর লওয়ার প্রয়োজন ভুলিয়াছে; এখন সুরসুন্দরই তাহার অত্যন্ত আপন-জন!

তা সে যাহাই হউক, বাহিরের বন্ধুত্বের সেই গুপ্ত গৌরব-মহিমা যে এমনভাবে, ঘরের লোক, দিদির কাছে অতর্কিতে ফাঁশ হইয়া যাইবে, ইহার প্রত্যাশা সুশীল মোটেই করে নাই। লজ্জায় পড়িয়া নমিতার মুখপানে তাকাইয়া কুণ্ঠিত-ভাবেই সে বলিল, "আমি ত প্রতিদিনই যাই না, এক-আধ দিন যাই। তেওয়ারীর কাছে আমি কখনো সিরাপ চাই নি; তিনিই নিজেই ধর-পাকড় করে খাওয়ান, কিছুতেই ছাড়েন না।.....তিনি নিজে খুব ভাল লোক কিনা.....!" অর্থাৎ, তেওয়ারীর ভালমানুষীটা সুশীলের এই ত্রুটি ও অপরাধের হেতু!

নমিতা হাসি চাপিতে পারিল না। চার্ম্মিয়ানও সকৌতুকে খুব খানিক হাসিয়া লইলেন ও তারপর নমিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমরা সবাই তেওয়ারী কম্পাউণ্ডারের ব্যবহারে সন্তুষ্ট বলে ডাক্তার মিত্র কাল দত্তজায়ার কাছে তাঁকে 'মহিলাগণের মনোরঞ্জনকারী' বলে বিদ্রূপ করছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শিশুর মনোরঞ্জন করায় তাঁর কি স্বার্থ আছে বল ত? ডাক্তার বোঝেন না। ওটা তার স্বভাব, ওতেই তাঁর আনন্দ!"

নমিতা মনে মনে একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। চার্ম্মিয়ান পুনরায় বলিলেন, "ডাক্তার মিত্র আদৌ সুবিধার লোক ন'ন্। তাঁর দৃষ্টিও যেমনি ছিদ্রান্বেষণে সূক্ষ্মদর্শী, রসনাটিও তেমনি তীব্র-কুৎসা-পরায়ণ। ভাল কথা, মিস্ মিত্র, তোমার উপর তিনি কেমন সন্তুষ্ট?"

নমিতার সমস্ত মুখমণ্ডল উচ্চ শোণিতোচ্ছ্বাসে রক্তোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আত্মদমন করিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "অব্যবস্থিতচিত্তানাং প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।—তাঁর সন্তোষ অসন্তোষ আমার পক্ষে সমান লোভনীয়।"

চার্ম্মিয়ান্ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বোঝ না; তুমি কাজের গণ্ডির বাইরে পা বাড়াও না, তোমার নাগাল ধরা অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। তা ছাড়া, স্মিথ্ তোমার মুরুব্বি আছেন বলে, ডাক্তার বাধ্য হয়ে তোমায় খাতির করে চলেন। আর এক কথা, 'হাসপাতাল-গ্রাউণ্ডে'র মধ্যে আজকাল তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখ্‌ছি; কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা ক'ন্ না।—ডাক্তার সত্যবাবু আর 'হেড্ কম্পাউণ্ডারের'

ওপর, মনে হয়, যেন খড়্গহস্ত হয়ে আছেন। ব্যাপারটা কি জান?"

নমিতা কোনও উত্তর দিল না; শুধু কাশিতে লাগিল।

চার্ম্মিয়ান্ কয়মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "কিন্তু যাই বল, পর-ছিদ্রান্বেষণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ হোক্, কিন্তু নিজের ব্যবহার-সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ! এক এক সময় তাঁকে বেত্রাঘাত করে, তাঁর পদমর্য্যাদা স্মরণ করিয়ে দিতে আমার ইচ্ছা হয়!....."

চার্ম্মিয়ানের রুদ্র সদিচ্ছার সংবাদ নমিতার কানে ঢুকিল কি না—ঈশ্বর জানেন; কিন্তু নমিতার কাশি অত্যন্তই বাড়িয়া উঠিল! চর্ম্মিয়ান্ চুপ করিতে বাধ্য হইলেন। নমিতার কাশি থামিলে তিনি বলিলেন, "তুমি ডাক্তার মিত্রের বাড়ী যাচ্ছ, কিন্তু সেখানে তাঁর দেখা পাবে না ত! তিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করতে গেছেন—।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া নমিতা বলিল, "সে জানি। আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি—।"

চার্ম্মিয়ান্ বলিলেন "ওঃ! আচ্ছা যাও।—তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমারও কিঞ্চিৎ আলাপ আছে। তিনি বেশ শিষ্ট-স্বভাবের ভদ্রমহিলা। এখানে যতগুলি বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আমার জানা-শুনা আছে, তার মধ্যে তোমার মাকে আর ডাক্তারের স্ত্রীকে আমার বড় ভাল লাগে—।"

শেষের কথাগুলি চার্ম্মিয়ান্ ভাঙ্গা বাঙ্গালাতে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, সুশীল তাহার অর্থ বুঝিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সোৎসুকে বলিল, "আর আমার দিদিকে—?"

হো-হো-শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া চার্ম্মিয়ান্ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার দিদিকে? আরে রাম! আমি আদৌ পছন্দ করি না, একেবারেই পছন্দ করি না!"

নমিতা হাসিতে লাগিল। সুশীল অপ্রতিভ হইয়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। হঠাৎ ফশ্ করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা আপ্‌নিও আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবেন চলুন না?"

"ধন্যবাদ" উচ্চারণ করিয়া, হাত-ঘড়ির দিকে চাহিয়া চার্ম্মিয়ান্ সহাস্যে বলিলেন, "অনুরোধ রাখ্‌তে পারলুম না ভাই, ক্ষমা কর। পনের মিনিটের জায়গায় সাড়ে পনের মিনিট খরচ করা আমার পক্ষে অসম্ভব! তোমরা যাও।"

চার্ম্মিয়ান্ হাঁস্‌পাতালের পথ ধরিলেন, নমিতা ও সুশীল মোড় ভাঙ্গিয়া ডাক্তারের বাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইল। বাড়ীর দ্বারের কাছে আসিয়া প্রবেশোদ্যতা নমিতা মুহূর্ত্তের জন্য একবার থামিল। তাহার বক্ষের মধ্যে বিদ্রোহোন্মত্ত হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইল!—আত্মসম্বরণের জন্য হঠাৎ সে হেঁট হইয়া ব্যস্তভাবে জুতার গোড়ালীর কাছে ইতস্ততঃ কি যেন খুঁজিতে লাগিল ও মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিল:—ছিঃ! শিষ্টতা ও সৌজন্যের অনুরোধে এখনই যাঁহার সম্মুখে গিয়া প্রসন্ন-মুখে দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া সে মনের মধ্যে গুপ্ত অন্ধকারে অপ্রসন্ন বিদ্বেষ পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিবে? নাঃ, এ

চাতুরী অসহ্য! ডাক্তার মিত্র যাহাই হউন্, নমিতা নিজের আত্মনিষ্ঠা বিসর্জ্জন করিবে কেন? পৃথিবীর যেমন অসীম হিংসা, অসীম বিদ্বেষ, অসীম ক্রূর নিষ্ঠুরতা আছে—তেমনই ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত করুণা দিয়াছেন! নমিতা কিসের দুঃখে সে সব মূল্যবান সম্পত্তির অপব্যবহার করিয়া, কোন্ দুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় কেন প্রতারক দরিদ্রের মত দেউলিয়া খতে নাম সহি করিয়া নিজের মর্য্যাদা ডুবাইবে,—পরকেও অশান্তিতে মজাইবে?—না, সে হইতে পারে না। নমিতাকে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে,—সে কোন্ পিতার কন্যা!—সংসারের সহস্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে সে যে আজিও নিজের মাথাটা বাঁচাইয়া চলিতেছে, সে শুধু ঐ একটিমাত্র অমর মন্ত্রের জোরে! —জীবনের যেখানেই কোনও দৈন্য-দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয়কে হীনতায় অভিভূত করিতে চাহিয়াছে, সেইখানেই সেই স্বর্গীয় স্মৃতি তাহাকে নীরব শক্তি-মন্ত্রে, তেজস্বিনী ও প্রাণবতী করিয়া তুলিয়াছে! সকল বিপদে, অক্ষয় কবচের মত তাহাকে রক্ষা করিয়াছে, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার চিত্তকে চেতনায় জাগ্রৎ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিদণ্ডে তাহাকে স্মরণ করাইয়া চলিতেছে,—সে শুধু এই বাহিরের রক্ত-মাংসে গঠিতা দেহসর্ব্বস্ব, নমিতা-নামধারিণী একটা সামান্যা নারী নহে,—সে জগতের শ্রেষ্ঠশক্তি-সমবায়ে সংগঠিতা, একটা জীবন্ত প্রাণী! তাহার জীবনের উদ্দেশ্য —আত্মোন্নতি! সে আত্মোন্নতি সাধনে, যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে জলে ডুবিতে, আগুনে পুড়িতে,—নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ডকে ছিঁড়িয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না! সে-সাধনার জন্য সে সব করিতে পারিবে,—সব! একজন অবজ্ঞেয়, অশ্রদ্ধেয়, সকলের ঘৃণা-বিদ্বেষের পাত্রকে শ্রদ্ধা-সম্মান তাহার পক্ষে—তাহার ব্রতের পক্ষে—করা কি এতই কঠিন কাজ! কখনই না।

এক নিমেষে নমিতার সমস্ত মন অকপট প্রসন্নতায় পরিষ্কার নির্ম্মল হইয়া গেল! বাহিক অবস্থা-বৈষম্যের প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব ও উৎপীড়নের হাত হইতে, এতক্ষণের পর সে যেন নিষ্কৃতি লাভ করিল,—আপনাকে ফিরাইয়া পাইল! আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া, সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "সিসিল, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে নমস্কার কর্‌তে ভুলিস্ নি যেন!"

বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া বুদ্ধিমান সুশীল ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "যদি কথা বল্‌বার দরকার হয়, তা' হ'লে তাঁকে কি বলে ডাক্‌বো দিদি?"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "দিদিমণি।—"

(১৫)

নমিতা ও সুশীল উভয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সম্মুখে উঠান। ও-পাশে রান্না-ঘরের রোয়াকের উপর দিয়া, থর-চরণে একজন মাঝারি রকমের সুন্দরী মধ্যবয়স্কা বিধবা রমণী চলিয়া যাইতেছিলেন; নমিতাকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন ও বিস্মিতভাবে বলিলেন, "তুমি কেগা?"

নমিতা এ-কথার উত্তর দিবার জন্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল; সুতরাং, অম্লান-বদনে বলিল, "আমি হাঁসপাতালের 'নার্স'। ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী কোথায়?"

অসন্তোষের সহিত ভ্রূভঙ্গী করিয়া সেই রমণী বলিলেন, "জানি নে কোথায়! ঐ ঘরে আছেন বুঝি, দেখো গে—।" মুখ ফিরাইয়া তিনি নিজের কাজে প্রস্থানোদ্যতা হইলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার নমিতাকে কিছু বিপন্ন করিয়া তুলিল। রমণীর তীব্র অবজ্ঞাব্যঞ্জক দৃষ্টি নমিতার সহিষ্ণুতাকে একটা জোর ধাক্কা হানিয়া গেলেও, তাহাকে টলাইতে পারিল না। কুণ্ঠিত হইয়া নমিতা নিজের কাছে নিজেই জবাবদিহি করিল, "উহার দোষ নাই। প্রয়োজনের অনুরোধে সকলেই অল্প-বিস্তর ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হন।—ইহার জন্য ধৈর্য্যহারা হইব কেন?" খুব শান্তভাবে, সবিনয়ে সে পুনরায় বলিল, "যদি অনুগ্রহ কোরে একবার তাঁকে ডেকে দেন—!"

ঘোরতর তাচ্ছিল্যের সহিত চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বিরক্তি-কর্কশ কণ্ঠে রমণী ডাকিলেন, "ওগো, অ—বৌদিদি! বেরিয়ে দেখসে বাবু, কে এসেছে—!" এই বলিয়া রমণী দ্রুতপদে অন্য ঘরে গিয়া ঢুকিলেন; দ্বিতীয় বাক্যের অপেক্ষায় দাঁড়াইলেন না।

নমিতা প্রমাদ গণিল। তাহার দুর্ভাগ্য! এই অদ্ভুত-স্বভাবের মানুষটির সুস্থ মেজাজ্‌কে ব্যস্ত করিয়া, সে ইহার সম্বন্ধে ত বড়ই অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু এখন আর লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিবার পথ নাই! যখন গৃহে ঢুকিয়াছে, তখন গৃহকর্ত্রীর সহিত না দেখা করিয়া ফিরিবার উপায় নাই।

অনতিবিলম্বেই ও-দিকের বারেণ্ডায় একটি অর্দ্ধোন্মুক্ত গৃহদ্বার-পথে দুইটি উৎসুক দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠের প্রশ্ন আসিয়া নমিতার কানে পৌঁছিল—"কে গা?"

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া নমিতা বিস্মিত হইল!—ইনিই কি ডাক্তার মিত্রের স্ত্রী!—আশ্চর্য্য সুন্দরী ত!.....না, গায়ের চামড়াটা কটা নহে; কিন্তু কি স্নিগ্ধ কমনীয়তা উহাঁর শ্যামোজ্জ্বল অবয়বের উপর শান্ত মধুর রূপের ছটা বিছাইয়া দিয়াছে! যান্ত্রিক নির্দ্দেশ-মত পরিমাপ করিতে গেলে, উহাঁর মুখের গঠন, হয় ত, নিখুঁত সুন্দর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না, কিন্তু কি নম্র কি ললিত ভাবের অভিব্যক্তি ঐ তরুণ মুখের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে! কি হৃদয়গ্রাহী সুন্দর একটা বিষণ্ণ করুণার ম্লান ছায়া ঐ শান্ত দৃষ্টির মাঝে নির্লিপ্তভাবে মিশিয়া রহিয়াছে! কি চমৎকার, কি অপরূপ রূপসী! নমিতার দৃষ্টি বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল! রমণীর 'কে গা—'প্রশ্নের উত্তরে সে আপনার পরিচয় দিতে ভুলিয়া গেল!

রমণী ক্ষণেক পরেই উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠিলেন, "ও, আপ্‌নি কুমারী মিত্র!—চিনিছি চিনিছি! মাপ করুন। নমস্কার!—আসুন!" এই বলিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া রমণী নমিতার হাত ধরিয়া কৃতজ্ঞ-কোমল কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নি আজই এখানে কষ্ট করে যে পায়ের ধূলা দেবেন, এত সৌভাগ্যের আশা ত আমি করি নি! আপ্‌নার অনুগ্রহকে কি বলে ধন্যবাদ দোবো?"

এই উচ্ছল আদরপূর্ণ অভ্যর্থনা-স্রোতে নমিতা যেন নূতন করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল! সঙ্কুচিত হইয়া সে বলিল, "এ কি

কথা। আপনি আমায় স্মরণ করেছেন, এ ত আমার গৌরবের বিষয়!—এ আনন্দে কষ্ট আবার কি?"

নমিতা মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু কথাটার সহিত পরিপূর্ণ আন্তরিকতার যোগ হইল কি না, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।—মনে মনে অনুতাপবিদ্ধ হইয়া, আত্ম-সংশোধনের চেষ্টায় প্রসঙ্গান্তর টানিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনি আমায় দেখ্‌বামাত্র চিন্‌লেন কি করে—?"

সলজ্জ হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁসপাতালে যান আসেন, আমি জানালা থেকে প্রায়ই দেখি!"

সুশীল বিস্ময়ে এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রমণীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল;—এইবার মৌন ভঙ্গ করিয়া অযাচিত আগ্রহে প্রশ্ন সুধাইয়া বসিল,—"আপনিই কি কুমার আর কিশোরের মা?"

রমণী সরল হাস্যের সহিত খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ ভাই, তা'রাই আমাকে 'মা' বলে।—আর তোমার নাম ত সুশীল? তোমাকেও আমি এর আগে দেখিছি। ছেলেদের কতদিন বলিছি, তোমাকে একবার ডেকে আন্‌তে, কিন্তু ওরা ত কথার বাধ্য নয়!"—এই বলিয়াই তাড়াতাড়ি কথাটা উল্টাইয়া লইয়া নমিতার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আসুন, কতক্ষণ রোদে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন?"

উক্ত সুমধুর আহ্বান করিয়াই তিনি সুশীলের হাত ধরিয়া নমিতার সহিত বারেণ্ডা পার হইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। নমিতা এই সুযোগে তাঁহার সম্পূর্ণ আকৃতিটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল।—শীর্ণ, দীর্ঘ, সুগঠিত ঋজু অবয়ব;—আয়ুপ্রধান-প্রকৃতির মানুষের স্পষ্ট পরিচয় সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত। শ্যাম-স্নিগ্ধ লাবণ্যোজ্জ্বল ক্ষীণ তনুটির চলন-ফেরন সমস্তই যেন ঈষৎ ক্লান্তি-অলস। ক্ষীণশক্তি ফুস্-ফুস্-দুইটী বাক্যোচ্চারণের জন্য শক্তিব্যয় করিয়া যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িতে চাহে; কণ্ঠস্বরের মাত্রা হ্রাস হইয়া যায়, নিঃশ্বাস হঠাৎ যেন রুদ্ধ হইয়া আসে, রক্তহীন মুখে পাণ্ডু বিবর্ণতা অধিকতর ম্লান হইয়া ঘনাইয়া উঠে। শীর্ণ দুর্ব্বল হাত-পাগুলা যেন নিজের শক্তিতে সচল নহে। তাহাদিগকে শুধু জবরদস্তি করিয়া খাটাইয়া যেন কাজ আদায় করা হইতেছে,—এমনই লক্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য্য পার্থক্য তাঁহার বিশাল উজ্জ্বল শোভাময় চক্ষু-দুইটিতে! তাঁহার নিস্তেজ ক্ষীণ আকৃতির মধ্যে এই আশ্চর্য্যজনক তেজস্বী দীপ্তিময় করুণা-সজল চক্ষু-দুইটি বড় চমৎকার বিশেষত্বপূর্ণ! ইহাঁকে ঠাহর করিতে হয়, শুধু যেন ইহাঁর চক্ষু দেখিয়া;—নচেৎ ইহার মধ্যে আর কিছু লক্ষণীয় আছে বলিয়া বোঝা যায় না। তাঁহার পরিধানে সামান্য একখানি সাড়ী ও সেমিজ। গলায় প্রকাণ্ড মোটা 'নেক্‌লেশ';—ক্ষীণ কণ্ঠ ও অপ্রশস্ত বক্ষের উপর সে কণ্ঠহার যেন অত্যন্ত বিসদৃশ ও ভারজনক হইয়া উঠিয়াছে। হাতে মোটা মোটা জল-তরঙ্গ চুড়ি; খুব টক্‌টকে গিনি সোণার জিনিস বটে, কিন্তু শীর্ণ প্রকোষ্ঠের উপর তাহার বৃহৎ আয়তন ও বিপুল পুষ্টতা আদৌ শোভনীয় মনে হইতেছে না।

নমিতা দেখিল, যে ঘরটায় তাহারা ঢুকিয়াছে, সে ঘরখানি বসিবার ঘর; অন্য

পক্ষে পোষাকের ঘরও বলা চলে। দেয়ালের গায়ে হুকে কতকগুলা 'কোট্' 'প্যাণ্ট' ঝুলিতেছে; ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর কতকগুলা বস্ত্রাদি স্তূপাকার করা রহিয়াছে। বোধ হয়, সেগুলা এই মাত্র 'ব্রাস্'-মার্জ্জনা করিয়া, গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। এক পাশে পোষাকের দেরাজ; তাহার উপর আয়না চিরুণী ব্রাস্ সাজান রহিয়াছে। পাশে টেবিল, খান-দুই চেয়ার, একটা বেতের মোড়া। দেয়ালের গায়ে খানকতক বাঁধান ছবি ও ফটো। একটা টেনিস ব্যাট্ এক পাশে ঝুলিতেছে। আরও দুই-চারিটা খুচ্‌রা জিনিস আছে।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সুশীলকে একটা চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। নমিতা মোড়াটা টানিয়া লইয়া, অন্য চেয়ারখানি ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর দিকে টানিয়া দিলে, তিনি হাসিয়া তাহা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি বসুন! কিছু মনে করবেন না। আগে এই পোষাকের বোঝাটা সাম্‌নে থেকে সরাই, তারপর...।"

তিনি পোষাকগুলা লইয়া দেরাজে তুলিতে তুলিতে পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নাকে এমন ভাবে গায়ে-পড়ে জ্বালাতন করার জন্যে আপ্‌নি কি মনে করছেন, জানি নে; কিন্তু আমি পরিচয় পেয়িছি, আপ্‌নি আমাদের 'পর' নন্। আপ্‌নার দাদা অনিলবাবু,—যিনি এখন বিলেতে রয়েছেন, তাঁর সহপাঠী বন্ধু অক্ষয় সেনের নাম, বোধ হয়, শুনে থাক্‌বেন।"

উৎসুক হইয়া নমিতা বলিল, "বিলক্ষণ! অক্ষয়-দা ত আমাদের বাড়ীর-লোক ছিলেন; আমার দাদার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আপনার—?"

দেরাজটা পোষাক বোঝাই করিয়া, ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী সস্মিতবদনে বলিলেন, "তিনি আমার মামাত ভাই। এবার মামার বাড়ী গিয়ে সব খবর শুন্‌লুম্।"

তিনি নমিতার খুব কাছে আসিয়া মেঝের উপর বসিলেন ও সলজ্জভাবে বলিলেন, "আমার ভয় হয়েছিল যে, যে-সম্পর্কের ছুতোয় আপ্‌নার উপর উপদ্রব করতে যাচ্ছি, আপ্‌নি, হয় ত, তা ভুলে গেছেন। সেই জন্যে চিঠিতে সব খুলে লিখ্‌তে পারি নি; ক্ষমা করবেন। আপনার বাবার কথাও সব শুন্‌লুম; তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।"

নমিতার বুকের ভিতর উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল, চোখ-দুইটা অনিচ্ছায় অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর মুখেও বিষণ্ণতার ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া তিনি নমিতার হাতখানি টানিয়া লইয়া, বেদনা-করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর অকাল-মৃত্যুতে আপ্‌নাদের সংসারটার বড় ক্ষতি হয়েছে! আপ্‌নি পড়াশুনা ছেড়ে এখন 'নার্শে'র কাজ করছেন শুনে অক্ষয়-দা কত দুঃখ্ করলেন।"

ঈষৎ হাসিয়া নমিতা বলিল, "বাবার মৃত্যুর পর অবস্থা মন্দ হওয়ায়, পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের সংস্রব থেকে আমরা এক রকম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।—তা ছাড়া দূর-দেশে চলে আসাও হয়েছে! আমি যে 'নার্শে'র কাজ কর্‌ছি, এ কথা অক্ষয়-দা'র মত

অনেকেই জানেন না। আমি ইচ্ছে করেই জানাই নি; জানি, তাঁরা শুনে শুধু দুঃখিত হবেন।"

বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপ্‌নাদের ভাই বোনের ছেলেবেলার বুদ্ধি-প্রশংসা যা শুনে এলুম, সে সবই দেখ্‌ছি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক্! আপ্‌নাকে ভক্তি কর্‌তে আমার ইচ্ছা হচ্ছে।"

অপ্রস্তুত নমিতা, পরিহাসের অন্তরালে লজ্জার দায় এড়াইবার জন্য, স্নিগ্ধ হাস্যে বলিল, "ও ইচ্ছাটা আপাততঃ মুল্‌তুবী রাখুন। আমাদের সেই ছেলেবেলার দাদা অক্ষয়বাবুর আপ্‌নিও যেমন ছোট বোন্, আমাকেও তাই মনে কোরে নিন্।"

নমিতার হাতখানা ঈষৎ পীড়ন করিয়া তিনি বলিলেন, "সে ত নিয়িচিই; দেখুন না, কত দূরের সম্পর্ক খুঁজে টেনে নিয়ে এলুম!"

নমিতা বলিল, "ভাগ্যেশ, খুঁজে টেনে-ছিলেন! আমি ত কিছুই জান্‌তুম না। আমার মা শুন্‌লে কত সুখী হবেন—!"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী হঠাৎ বিচলিত ভাবে বলিলেন, "কিন্তু আপ্‌নাদের ডাক্তারবাবু এখনো কিছু জানেন না।"

নমিতা চমকিয়া উঠিল! নূতন পরিচয়ের আনন্দে পুরাতন কথা সে যেন এক নিমেষে সব ভুলিয়া গিয়াছিল; ডাক্তার বাবুর নাম পর্য্যন্ত! সহসা অতর্কিত খড়্গাঘাতের মত এই আনন্দের মাঝে একটা কড়া ঘা পড়িয়া যেন তাহাকে ত্রস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। নমিতার মনে পড়িল, যাহার সহিত সে কথা কহিতেছে, তিনি তাহাদের হাসপাতালের ডাক্তার প্রমথ মিত্রের স্ত্রী!—সেই ডাক্তার প্রমথ মিত্র—! যিনি—! সঙ্গে সঙ্গে, কে জানে কেন, একটা গুপ্ত উদ্বেগ যেন তাহার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া ধরিল! নমিতার মনে হইল, "উঠিতে পারিলে বাঁচি! আর এখানে এক মুহূর্ত্তও নয়!"

নমিতার আভ্যন্তরিক চাঞ্চল্য, ডাক্তার-বাবুর স্ত্রী বুঝিলেন কি না, বলা যায় না; কিন্তু বোধ হইল, তিনি যেন একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি ত অনেক দিন আগে অক্ষয়-দাকে দেখেছেন। এখন তাঁর ফটো দেখ্‌লে চিন্‌তে পারেন?—দ্যাখের গায়ে ঐ ফটোখানায়—!"

নমিতা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, অত্যা-বশ্যক আগ্রহে ফটোর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রাণপণে দৃষ্টি সংযত করিয়া একাগ্র মনোযোগে ফটো দেখিতে লাগিল। তাহার ভয় হইতেছিল, পাছে এই মুহূর্ত্তে ডাক্তার মিত্রের স্ত্রীর সহিত তাহার চোখোচোখী হইয়া যায়!—পাছে তিনি তাহার মুখ দেখিয়া অন্তরের প্রচ্ছন্ন অসন্তোষ টের পান্!..... ছি, ছি, সে বড় লজ্জা, বড় দুঃখের বিষয়! নমিতার মনের মধ্যে অস্বস্তি ও কুণ্ঠা যেন জমাট বাধিয়া উঠিল।

পরক্ষণে, তাহার মনের সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিক্ষেপ যেন স্নেহার্দ্র সৌহৃদ্যে বিগলিত করিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "অক্ষয়-দাকে চিন্‌তে পারেন্ নি? এই দেখুন, তাঁর চেহারা!" এই বলিয়া তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। নমিতা এতক্ষণে ফটোর উপর যথার্থ মনো-যোগ দিবার শক্তি পাইল। প্রসন্ন হাস্যে সে বলিল, "হাঁ চিনিছি; অনেক বদ্‌লে

গেছেন। এ-খানা কত দিন আগে তোলা হয়েছিল?"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "তিন বৎসর। আর এই দেখুন, এরা সব আমার মামার বাড়ীর ছেলে, এদের কাউকে চিন্‌তে পারবেন না।—আর এ পাশে ইনি আমার মা—।"

"বিধবা!—"এই বলিয়া বিস্ময়-ব্যথিত দৃষ্টি তুলিয়া নমিতা ডাক্তারের স্ত্রীর পানে চাহিল। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি যখন খুব ছোট, তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। বাবার কথা ভাল মনেও পড়ে না।"

নমিতার মন অভিভূত হইয়া পড়িল! নিজের পিতার কথা মনের ভিতর জ্বল্‌-জ্বল করিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে মাতার বর্ত্তমান অবস্থাও স্মরণ হইল। বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টি তুলিয়া সে চিত্রের সেই জীবন্ত বেদনাঙ্কিত বিধবা-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিল! তাহার বুকের উপর যেন গভীর বিষাদ চাপিয়া বসিল!

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা, এ চেহারাটা কা'র বল্‌তে পারেন?—এই যে কোলে কচি ছেলে? মার পাশে বসে,—এই যে এক হাতে পাখা—?"

নমিতা মূর্ত্তিটা দেখিল; তাহার পর ডাক্তারের স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, "আপ্‌নার কি?—না, ও চেহারা যে বড্‌ড ছেলেমানুষের বোধ হচ্ছে! আপ্‌নার ছোট বোন্ বোধ হয়।"

হাসিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না, আমি-ই—।"

সবিস্ময়ে নমিতা বলিল, "বলেন কি! তিন বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! আপ্‌নার বয়স এখন—?"

তিনি বলিলেন, "উনিশ বছর। ষোল বছরে ঐ ছেলেটি আমার হয়েছিল। মাস-তিনেক বেঁচেছিল, কিন্তু এক দিনের জন্যে সে সুস্থ ছিল না। দেখ্‌ছেন, কত কাহিল চেহারা...!"

নমিতা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "তা'হ'লে কি কুমার-কিশোর আপ্‌নার ছেলে নয়? তারা আট-দশ বছরের করে হবে, নয়?"

সুকোমল হাস্যে তিনি বলিলেন, "আপ্‌নি বুঝ্‌তে পারেন নি? আমি তাদের বিমাতা!—দেখুন, ও ছেলেটা এত সকাল সকাল গেছে বলে, আমার কিছু দুঃখু নেই;—কিন্তু আমার মত স্বাস্থ্যহীনা দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, ও যে পৃথিবীতে একদিনের জন্য সুস্থতার মুখ দেখ্‌তে পায় নি, এটা আমার বড় দুঃখু আছে!"

ব্যথিতা নমিতা ইহার উত্তরে কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। অথচ একটা কিছু বলা চাই; তাই কোন মতে আত্মদমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তারপর আর আপ্‌নার ছেলে হয় নি?"

উদ্গত অশ্রু দমন করিয়া, মুখে সেই পূর্ব্বের স্নিগ্ধ কোমল হাস্যমাধুরীটুকু জোর করিয়া টানিয়া ফুটাইয়া তিনি বলিলেন, "আর বল্‌বেন না! একজনের জীবনের উপর দিয়ে যথেষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিছি; আর অপরাধের মাত্রা বাড়াতে কামনা নেই। শ্বশুরের বংশধর যারা বেঁচে আছে, তারা দীর্ঘজীবী হোক্, আপ্‌নারা এই আশীর্ব্বাদ

করুন।" হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আপ্‌নারা বসুন ;—আমি চা করে আনি। আপ্‌নার হাসপাতাল যাওয়ার আর বেশী দেরি নেই, সেটা ভুলে যাচ্ছিলুম।"

নমিতা 'হাঁ,' 'না,' কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নমিতা ফাঁপরে পড়িল ; একটু ইতস্ততঃ করিয়া অগত্যা আবার আসিয়া নিজের স্থানে বসিল।

সুশীল নমিতার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "দিদিমণি বেশ ভাল লোক, নয় দিদি ? আচ্ছা, তুমার আর কিশোরকে দেখ্‌তে পাচ্ছি নে কেন বল দেখি ? নির্ম্মলবাবুই বা কোথায় ?"

অন্যমনস্কা নমিতা বলিল, "কি জানি—!"

সুশীল। এবার দিদিমণি এলে জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো ?"

"কর্‌তে পারিস্—" এই বলিয়া নমিতা অন্যদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

সহসা দ্বারের নিকট হইতে তীব্র কর্কশ কণ্ঠস্বরে বিরক্তিসূচক ঝঙ্কার হানিয়া কে বলিয়া উঠিলেন, "বৌদিদি, ওগো বৌদিদি! বলি সারা-ক্ষণই কি গল্প নিয়ে—!"

নমিতা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল,—সেই তিনি।—বাড়ী ঢুকিয়াই প্রথমে যাঁহার সুমধুর অভ্যর্থনায় সে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিল ! তখন দূর হইতে সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই, এবার ভাল করিয়া দেখিল :—রমণীর কঠিন ভ্রূভঙ্গীটুকু অত্যন্ত ভয়ানক বটে ! তাঁহার ওষ্ঠাধর ভেদ করিয়া অকারণে যেন একটা ক্রূর-বিদ্বেষ ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িতে চাহিতেছে। রমণীর দৃষ্টি-সঞ্চালনে রমণীয়তার লেশমাত্র নাই ; আছে শুধু, কঠোর শাসন ও কর্ত্তৃত্বের দম্ভ ! নমিতার মুখের উপর সেই কঠোর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "ঠাকুরুণ গেলেন কোথা ? ঢং করে উনুনে আগুন দিতে বলে, উনি—! এখানে নেই ?"

নমিতা দৃষ্টি নামাইয়া বলিল, "না, তিনি বেরিয়ে গেছেন।"

এতখানি শাসন-কর্ত্তৃত্ব নিষ্ফল ও ব্যর্থ হইয়াছে, দেখিয়া রমণী নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হইলেন। অনাহতচিত্তে নিরাপদে প্রস্থিতা শাসিতার উপর রাগও, বোধ হয়, কিছু বাড়িল। কিন্তু আপাততঃ সেটা চাপিয়া যাওয়া ভিন্ন গতি নাই দেখিয়া, তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া, ঘরে ঢুকিয়া নমিতার সম্মুখে দুই কোমরে দুই হাত রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি, বুঝি, হাস্‌পাতালে দাদার কাছে চাকরী কর ?"

নমিতা বুঝিল, 'দাদা', অর্থাৎ প্রথম মিত্র ! কিন্তু কাহার কাছে চাকরী করে, তাহার সবিশেষ সংবাদ খুলিবার দুর্ভোগ সহ্য করা অপেক্ষা ইহার কথায় সায় দিয়া সুস্থ হওয়াই বেশী সুবিধা, বুঝিয়া নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "হুঁ !"

শূন্য চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া, প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতার প্রতিমূর্ত্তির মত রমণী সগর্ব্বে উঁচু হইয়া জাঁকিয়া বসিলেন। রান্নাঘরের ধোঁয়ার গন্ধে সুগন্ধ ও বহুদিনের সঞ্চিত তৈল, কালী ও হলুদের রঙে সুচিত্রিত পরিধেয়ের আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে তিনি অবজ্ঞামিশ্রিত অনুগ্রহে নমিতার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নমিতা

কত মাহিনা পায়, সে টাকাগুলা কি করে, সে কেন আজিও বিবাহ করে নাই, কোথাও তা'র বর ঠিক্ আছে কি না, এবং সে কিরূপ বর বিবাহ করিবে, ইত্যাকার প্রশ্নের সমস্যা ভঞ্জন করিতে করিতে নমিতা বিব্রত হইয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে মুক্তিদাত্রী শান্তিময়ীর মত ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটা থালার উপর দুই 'কাপ্' চা ও দুইখানা রেকাবীতে খাদ্য-দ্রব্য সাজাইয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং তাহাদের প্রশ্নোত্তরের মাঝে পড়িয়া সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে রসভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "উঠুন কামাই যাচ্ছে, বামুনদিদি! আপনার মোহনভোগ তৈরী করে নিয়ে, ভাত চড়িয়ে দিন্ গে, যান্।"

বামুনদিদি আশ্চর্য্যভাবে বলিলেন, "খাবার হবে না?—জল-খাবার?"

হাতের থালাখানা মেঝের উপর নামাইয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "না; ঠাকুরপো কিশোরকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বাগান-ভোজ করতে গেছেন; আজ রাত্রে তাঁরা কেউ কিছু খাবেন না। আপনার দাদার লুচি,—সে সব-শেষে হবে।"

সুশীল বলিল, "কুমার কোথা?"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বলিলেন, "সে তার ঠাকুমার সঙ্গে দেশে গেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে বামুনদিদি শ্লেষ-ঝঙ্কৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "সে ছেলের কথা ছেড়ে দাও। 'ন্যাকা' নেই 'পড়া' নেই, ইস্কুল কামাই কোরে নেচে বেড়ানই তার কাজ। অমন যে বাঘের মত বাপ, তাকেও সে ভয় করে না! আর তাও বলি, বাপের ত গেরাজ্যি নেই!...না হলে, ছিষ্টি সংসারে সৎমা আর কা'র নেই বাপু? এই যে বিশোর তার চাইতে কত ছোট! সে কি সৎমার কাছে থাকতে পারছে না?—না, সৎমা তাকে বর করছে না? নিমু তাই কাল কত রাগ করছিল যে, ঠাকুমাই আদর দিয়ে নাতির মন বিগড়ে দিলে!"

তাহাদের পারিবারিক তথ্য শুনিবার জন্য নমিতার কিছুমাত্র কৌতূহল ছিল না। কিন্তু বামুনদিদির দুরন্ত রসনার ভাষা এমনই অনর্গল উচ্ছ্বাসে উৎসারিত হইয়া গেল যে, নমিতাও নির্ব্বাক্ ভাবে সমস্ত শুনিতে বাধ্য হইল!

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী টেবিলের কাছে গিয়া কতকগুলা ক্রুশ, কাঁটা, পশম, সুতা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি অপরিচিতা নমিতার সম্মুখে, সাংসারিক প্রাণীগুলির এই সব পরিচয় প্রকাশ হওয়ার ব্যবস্থায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। নমিতাও লজ্জিতা হইল। এ বিষয়ের বাড়াবাড়িটা এইখানে শেষ করিবার জন্য, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার আর দশ মিনিট মাত্র দেরী আছে; আজ তা হ'লে উঠি। সুশীলকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে।"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটা ক্রুশ ও সবুজ রেশমের এক গুলি সুতা লইয়া নমিতার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, "স্মিথের কাছে শুনিচি, আপনার কাছে অনেক রকম 'নেক্‌টাই'য়ের নমুনা আছে। যদি অনুগ্রহ করে আমায় একটা নমুনার গোড়া তুলে দেন—!"

সাগ্রহে হস্ত বিস্তার করিয়া নমিতা বলিল,

"বেশ ত দিন্, আমি কালই আপ্‌নাকে পাঠিয়ে দোবো।"

নমিতার হাতে সূতা ও ক্রুশ দিয়া ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বামুনদিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বামুনদিদি, উনুন কামাই যাচ্ছে, ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে দিয়ে আসুন!"

"যাই—"বলিয়া বামুনদিদি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

ছিন্নপুষ্প।

একদৃষ্টে কি দেখিতে তুমি,
যত দিন ছিলে এ ধরায়?—
কা'র সাথে হ'ত তব কথা,
আধ আধ নূতন কথায়?
কিসের তরে তত হাসি তব,
খিল্ খিল্ আপনার মনে?—
জিজ্ঞাসিলে বার-বার তবু,
কও নি' কথা আমাদের সনে!
এসেছিলে সবার শেষে তুমি;
গেলে কেন সবার আগে চলি?
কি জানি কি উপদেশ কেবা
কানে কানে দিয়া গেলে বলি!
আঁধার ঘরের মাণিক তুমি,
ঘরে মোর জ্বেলেছিলে বাতি!
অসময়ে চলে গেলে কেন,
একলা ফেলে, না পোহাতে রাতি?
দেবের পূজার শুভ্র ফুল!—
এর যোগ্য নহে ত এ ধরা!
তাই বুঝি না ফুটিতে ওগো,
তুলে নিল আগে হ'তে ত্বরা!

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

গানের স্বরলিপি। ৫

পূরবী—একতালা।

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে;
শূন্য ঘাটে একা আমি;
পার্ করে' লও, পার্ করে' লও, পার্ করে' লও, খেয়ার নেয়ে!
ভেঙ্গে এলাম খেলার বাঁশি,
চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি;
সন্ধ্যা-বায়ে, শ্রান্ত কায়ে, ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে।

ও-পারেতে বয়ে ঘরে,
সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির 'পরে ;
এস এস শ্রান্তি-হরা,
এস শান্তি-সুপ্তি-ভরা ;
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে।

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

০ ১ ২ ৩

II { গা ঋা পঋা। গা গঋা সঋসা। না -সনা সা। রা গা -া } I
বে লা গে ০ ল ০ তো মা ০ র প ০০ থ চে য়ে ০

০ ১ ২ ৩

I গঋা -গঋপা পা। পা পা -া। পা ঋপা -ঋপা। ঋপা গা -া I
শূ ০ ০০০ ন্য থা টে ০ এ ০ কা ০০ আ ০ মি ০

০ ১ ২ ৩

I গা -ঋগা ঋা। পঋা গা -া। গা -ঋগা ঋা। পঋা গা -ঋা I
পা ০ র্ ক রে ০ ল ও পা ০ র্ ক রে ০ ল ও

০ ১ ২ ৩

I গা -ঋগা ঋা। পঋা পনা -ধনধা। পা ঋা -পঋা। গঋা গঋপাঃ-ঋাঃ II
পা ০ র্ ক রে ০ ০ ল ও ০০ খে য়া ০ র নে ০ ০০ যে ০

০ ১ ২ ৩

II { -া -া পা। গা পা ধা। ধা র্সা -নর্সর্রা। র্সা র্সা -া I
০ ০ ভে ঙ্গে এ লাম খে লা ০ ০ র বাঁ শি ০

০ ১ ২ ৩

I র্সা র্সা নর্সা। না ধা -া। ধা -না ধনর্সা। নধা পধপাঃ -ক্ষঃ } I
চু কি ০ য়ে এ লে ম কা ০ ০ ন্না ০ ০ হা সি ০ ০ ০

০ ১ ২ ৩

I গঋা -গঋপা পা। পা পা -া। পা -ঋপা ঋপা। ঋপা গা -া I
স ০ ০ ০ ০ ন্যা বা য়ে ০ শ্রা ০ ০ ন্ত কা ০ যে ০

০ ১ ২ ৩

I ঋা পা -ঋপনা। ধা পা -া। ঋপা গাঃ -ঋঃ। গঋা গঋপাঃ -ঋঃ I
মু খে ০ ০ ০ ন য় ন ০ আ মে ০ ছে ০ ০ যে ০

[সা সা -পা] ১ ২ ৩
| (গা গক্ষা -গক্ষপা। পা পা -া। পা ক্ষপা -ক্ষপা। ক্ষা গা -া ।
ও পা • • • রে তে • ব রে • • ব রে •

০ ১ ২ ৩
| গা -া ক্ষা। গক্ষা -পা পক্ষা। গা গক্ষা -গক্ষপা। ক্ষপা গা -া ।
স • ক্ষা • দী • • প অ লি • • • স • রে •

০ ১ ২ ৩
| -া -ঝা ঝা। গা ঝা ঝা। সা -া সা। সনা -সা সা ।
• • আ র তি র শ • ঋ বা • • জে

০ ১ ২ ৩
| সা সা -পা। পা পা -ক্ষা। ঋ গা -মা গঋা। গ -স ঋা ঋা সা) ।
হ দ্ • র ম • ম্বি • র • প • রে

০ ১ ২ ৩
| (-া -া গা। গা পা ধা। ধা র্সা -নর্সর্রা। র্সা র্সা -া ।
• • এ স এ স শ্রা ন্তি • • • হ রা •

০ ১ ২ ৩
| -া র্সা নর্সা। না -ধা ধা। ধা -না ধনর্সা। নধা পধপাঃ -ক্ষঃ) ।
• এ • স শা • ন্তি ব্ • ষ্টি • • ভ • • • রা •

০ ১ ২ ৩
| গা গক্ষা -পা। পা পা -া। পা ক্ষপা -ক্ষপা। ক্ষা গা -া ।
এ স • • এ স • তু মি • • • এ স •

০ ১ ২ ৩
| ক্ষা পা -ক্ষপনা। ধা পা -া। ক্ষপা গাঃ -ক্ষঃ। গক্ষা গক্ষপাঃ -ক্ষঃ) ।
এ স • • • তো মা র • ত রী • • বে • রে • • •

সুর-সহযোগে তালের বোল্।

০ ১ ২ ৩
| সা র্সর্রা র্সা। র্সা পা ধা। মা পা ণধা। পমগা গা মা ।
| খুব তার নাম্। বেশ্ ধুম্ ধাম্। কয় দিন্ পরে। সকলি সুম্ সাম্ ।
| ধিন্ ধিন্ ধা ধা থুন্ না ক ত্তে ধাগে তেটেকেটে ধিন্ ধা ।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি।

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং শস্য-শ্যামলাং"—এই কয়টী কথায় বাঙ্গালা-দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের তুল্য উর্ব্বরা স্থান আর কোথাও নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অন্যান্য স্থানে কৃষি-বিষয়ে উন্নতি করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, বাঙ্গালা-দেশের স্বাভাবিক অবস্থাতেই তাহা লাভ হয়। সুতরাং, এখানে কৃষিবিষয়ে আরও উন্নতি হইলে, দেশের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা।

বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভাগেই গঙ্গা এবং তাহার শাখানদী-সকল প্রবাহিত। এই সকল নদীর পলি পড়িয়া কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করে এবং নদীর জল অনেক স্থান প্লাবিত করিয়া মৃত্তিকাকে সরস করিয়া দেয়।

দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং সমুদ্র-তীরস্থ সুন্দরবন জঙ্গলাকীর্ণ হইলেও সে-সকল স্থানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলপাইগুড়ী হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অত্যন্ত উর্ব্বরা।

বঙ্গদেশের বার্ষিক বারিপাত সাধারণতঃ ৬০ ইঞ্চি। এখানকার লোক-সংখ্যা ৪৬, ৩০৫,৬৪২, ইহার ভূমির পরিমাণ ৮৪,০৯২ বর্গ-মাইল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত 'ডিভিসন' বা বিভাগ আছে। যথা,—বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি ডিভিসন, দার্জিলিং, রাজসাহি, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম। ইহার মধ্যে কুচবিহার এবং পার্ব্বত্যভূমি ত্রিপুরাও অবস্থিত।

বঙ্গদেশের সমগ্র ভূমির পরিমাণ ৫০, ৪২৯,৯৮৪ একর; তন্মধ্যে আবাদের উপযুক্ত ৩৬,০৭০,৩৬৭ একর, আবাদের অনুপযুক্ত ১০,১৫২,৬২৭ একর; এবং জঙ্গল ৪,২২৯,৯৯০ একর। বঙ্গদেশের ২৷৷০ বিঘাতে এক একর পরিমাণ জমী হয়।

বাঙ্গালা-দেশে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাহারা বাঙ্গালীই হউন বা অন্যদেশবাসীই হউন, প্রায় সকলেই চাউলের অন্ন আহার করিয়া থাকেন। প্রত্যেক লোক, ছোট-বড়, গড়ে প্রতিদিন আধ সের চাউলের অন্ন ব্যবহার করিলে প্রত্যেকের বাৎসরিক প্রায় ৪৷৷০ (সাড়ে চারি) মণ চাউল প্রয়োজন হয়। সাড়ে চারি মণ চাউল প্রস্তুত করিতে ৯ মণ ধান্যের প্রয়োজন। অতএব সমগ্র অধিবাসীর অন্ন সরবরাহের জন্য বাঙ্গালাদেশে বাৎসরিক ৩২৪,১৩৯,৪৯৪ মণ ধান্যের প্রয়োজন। প্রতি-বিঘায় ৬ মণ ধান্য হইলে, সমস্ত লোকের উক্ত হারে আহারের জন্য ৫৪০২৩২৪৯ বিঘা, অর্থাৎ ২১,৬০৯,২৯৮ একর জমীতে ধান্যের চাষ হওয়া প্রয়োজন।

১৯১৩-১৪ সালের সরকারী রিপোর্টে জানা যায়, বাঙ্গালা-দেশে কত জমীতে কোন্ শস্যের আবাদ হইয়াছিল। যথা,—

ধান্য—১৯,৭১৫,০০০ একর।
গম—১৪৪,০০০ একর।
যব—৯৪,০০০ একর।
দালের শস্য—১,৩০২,০০০ একর।
তৈল-শস্য—১,৮০৫,০০০ একর।
ইক্ষু—২৭৭,০০০ একর।
তুলা—২৬,০০০ "
পাট—২,১১৬,০০০ "

অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা-দেশের অন্ন-সংস্থানের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহা হইতে অল্পই ধান্য উৎপন্ন হয়; পরন্তু অধিক নহে। তাহা হইতেও যদি আবার বিদেশে ধান্য রপ্তানি হয়, তাহা হইলে দেশে অন্নাভাব অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালা-দেশের উন্নতি করিতে হইলে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত, যাহাতে ধান্য বিদেশে রপ্তানি না হয়। প্রত্যেক গ্রামের ধনবান্ লোক যদি কৃষক-দিগের নিকট হইতে ধান্য ক্রয় করিয়া, তাহাই আবার কৃষকদিগের নিকট ধারে খাটান, তাহা হইলে কৃষকদিগেরও উপকার হয় এবং তাঁহারাও তাহাতে লাভ করিতে পারেন। বাঙ্গালা-দেশ নিজের ধান বাহিরে পাঠাইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল কিনিয়া খায়। একটু সুবন্দোবস্ত হইলে, আমাদের ধান্য আমাদের দেশে থাকিয়া ব্রহ্মদেশের জিনিস বিদেশে যাইতে পারে।

বাঙ্গালাদেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এখানে মানুষ অন্যান্য অনেক স্থানের ন্যায় অন্নাভাবে কষ্ট পায় না। সে যতই দরিদ্র হউক না কেন, বাঙ্গালাদেশে সকলেই দুই বেলা অন্নাহার করিতে পায়; উপবাস বা অল্পভোজনে কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু বিহার প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ দরিদ্র লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া আহার পায় না। অন্নাহার ত দূরের কথা, নিকৃষ্ট জাতীয় শস্যও তাহাদের প্রচুর পরিমাণে জোটে না। বাঙ্গালা-দেশের দুর্ভিক্ষ-কষ্টও অন্য দেশ অপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। এ সকলের মূল কারণ, বাঙ্গালা-দেশের জমির উৎপাদিকা শক্তি অধিক, এবং বাঙ্গালাদেশের কৃষকগণ কৃষিকার্য্য ভালরূপ জানে।

সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে বাঙ্গালা-দেশে ৩½ কোটী অধিবাসী কৃষিকার্য্য করে, তন্মধ্যে ৩ কোটী অধিবাসী কৃষক এবং অবশিষ্ট তাহাদিগের ভৃত্য বা কুলি। অর্থাৎ বঙ্গদেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ½ অধিবাসী কৃষি-কার্য্যে ব্যাপৃত।

বাঙ্গালাদেশে ধানের জমিই অধিক; রবি-শস্য বা আউসের জমী অল্প। ধানের জমীতে পাটের চাষ হইয়া থাকে। পাটের চাস যত অধিক হইবে, ধানের চাষ সেই পরিমাণে কমিয়া যাইবে। কিন্তু পাটের মূল্য এত অধিক যে, ধানের চাষ অপেক্ষা, পাটের চাষ করাতেই লাভ বেশী। ধানের পরিবর্ত্তে যদি পাটের চাষে দেশে অধিক অর্থাগম হয়, তাহাতে দেশের তত ক্ষতি হয় না। দেশের উন্নতির পক্ষে পাটের চাষের প্রয়োজন। দেশের ধান্য যদি বাহিরে চলিয়া না যায়, তাহা হইলে পাটের চাষে উপকার ব্যতীত অপকার হয় না।

রবি-শস্যের জমী বাঙ্গালাদেশে অতিশয় অল্প। সেই কারণে, সকল প্রকার রবিশস্যের বাঙ্গালাদেশে আবাদ করা হয় না। তামাক, চা, নীল, তূলা, তিসি, সরিষা, তিল, মকাই, ছোলা প্রভৃতি অতিশয় অল্পেরই আবাদ এখানে হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা-দেশের ভবিষ্যদ্-উন্নতি-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, কৃষি-সম্বন্ধে আলো-চনাই প্রথমে আবশ্যক। কৃষিকার্য্যে উন্নতি না হইলে, বাঙ্গালা-দেশের অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির আশা নাই। কারণ, অন্নসংস্থান প্রথমেই আবশ্যক।

আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মিষ্টার জন ওয়ানামেকার (Mr. John Wanamaker—a cabinet officer of America) ভারতবর্ষে আগমন করিলে, লক্ষ্ণৌ-সহরে কলেজ-গৃহে তাঁহাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করা হয়। তিনি তখন একখণ্ড খড়ি লইয়া বোর্ডে লিখিয়া দিলেন—

India Needs
Heads to think,
Hearts to feel,
Hands to work.

অর্থাৎ, ভারতবর্ষে এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি, হৃদয়বান্ ব্যক্তি এবং কর্ম্মক্ষম ব্যক্তির অভাব।

তিনি নানাকথা-প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, নিজ-নিজ উন্নতি ও দেশের উন্নতির জন্য *Infra dig*—ashamed to dig—অর্থাৎ মৃত্তিকা-খননে লজ্জা বোধ করিলে চলিবে না। 'There is no honest work that can degrade me'.—সাধুতার সহিত কার্য্য করিলে, আত্মোন্নতির জন্য যে কোন কার্য্যই করি, তাহাতে লজ্জা নাই।

বাঙ্গালা-দেশের উন্নতির জন্য বঙ্গের সন্তানগণকে খাটিতে হইবে। যেখানে ছোট ছোট-লোকেরা অগ্রসর হয় না, সেখানে ভদ্রসন্তানগণ নিজেরাই বনজঙ্গল কাটিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইবেন। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে-সকল উপায় গ্রহণ আবশ্যক, ভদ্রসন্তানেরা তাহা নিজ-হস্তে করিয়া দেখাইবেন ও ছোট-লোকদিগকে তাহা করিতে শিখাইবেন। গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে গ্রামের উন্নতির জন্য নিজে খাটিয়া সাধারণ লোককে উৎসাহিত করিতে হইবে।

বঙ্গে কৃষির উন্নতি হইলে, বঙ্গের ম্যালেরিয়া চলিয়া গেলে, বাঙ্গালা-দেশ আবার সত্যই সোনার বাংলা হইবে। তখন তাহার সহিত শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার উন্নতি আপনা হইতেই আসিবে।

বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা আবশ্যক।

১। প্রজাসত্ব-বিষয়ক আইন।

কৃষকগণ যে জমী লইয়া চাষ-আবাদ করিবে, তাহাতে তাহাদের সত্বসম্বন্ধে গোলযোগ থাকিলে, তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। একজন কৃষকের হয় ত ১০ বিঘা জমী আছে, কিন্তু সে অপর জমী ক্রয় করিয়া জোত বাড়াইতে ইচ্ছা করিলে, নানা-প্রকার গোলমালে পড়িয়া থাকে। কোন জমীদারের আমলা ক্রেতার নিকট চৌথ চাহিবেন, কেহ কেহ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের নিকট হইতেই চৌথ চাহিবেন, কেহ বা রসিদ ক্রেতার নামে দিবেন না, কেহবা পৃথক্ সেলামী চাহিবেন, ইত্যাদি নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। একজন প্রজার মৃত্যুর পর, তাহার ওয়ারিসের নাম খারিজ করিতে কোন কোন জমিদারের আমলাগন কতই ওজর-আপত্তি করিয়া থাকেন। কোন প্রজা উইল করিয়া গেলে, জমিদারের আমলাদের অনেক স্থলে গোলমাল বাধাইবার একটা পন্থা হয়। এই প্রকার বিভ্রাট অনেক স্থলে দেখা যায়। আইন-আদালতে প্রজাকে কত সময় যাইতে হয় ও কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিয়া মকদ্দমা

হইয়াই থাকিতে হয়। ইহা বাঙ্গালা-দেশে বিরল নহে।

প্রজাসত্ব-সম্বন্ধে পরিষ্কার আইন না থাকিলে, কো-অপারেটিব সোসাইটির কার্য্যেও নানাপ্রকার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। বেহার অঞ্চলের কো-অপারেটিব বিভাগের সরকারী রিপোর্টে (১৯১৩-১৪) এই বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে :—

"Another subject discussed at the conference was the importance from the co-operative point of view of settling once for all the question of transfer of occupancy right..... It was agreed that the leaving of this right to be governed by local custom has proved disastrous to both landlord and ryot alike, since it is responsible for a large proportion of agrariculitigation, which involves all classes whether they will or no." ——

"কন্‌ফারেন্সে আর একটী প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, যাহাতে প্রজাসত্ব বিক্রয়-সম্বন্ধে সকল প্রকার কথায় একেবারে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এইরূপ মত প্রকাশ করা হয় যে, স্থানীয় প্রথার উপর প্রজাসত্ব বিক্রয়ের প্রশ্ন ছাড়িয়া দেওয়ায় প্রজা এবং জমিদার উভয়ের পক্ষেই ভয়ানক কুফল ফলিয়াছে। কারণ, ইহার ফলে গ্রাম্য মকদ্দমা অধিক পরিমাণে হইয়াছে, যাহাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেককে জড়িত হইতে হইয়াছে।"

অতএব প্রজাসত্ব-আইন-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিবর্ত্তন বিশেষ প্রয়োজন :—

(ক) প্রজার মৃত্যুর পর, তাহার ওয়ারিস বা যাহার নামে উইল হইয়াছে, কলেক্টরিতে দরখাস্ত দিলেই, জমিদার তাহার নামে রসিদ দিতে বাধ্য হইবেন।

(খ) প্রজাসত্ব ইচ্ছানুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারিবে। জমিদার কেবলমাত্র খাজনার দ্বিগুন,—বা যেরূপ গবর্ণমেণ্ট উচিত মনে করেন,—সেলামী পাইবেন। এই ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে কলেক্টরিতে দরখাস্ত ও টাকা জমা দিলেই জমিদার ক্রেতার নামে রসিদ দিতে বাধ্য হইবেন।

(গ) কো-অপারেটিব ব্যাঙ্কের টাকার জন্য প্রজার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের শস্য উভয়ই আইনের মধ্যে বাধ্য থাকিবে; তবে, জমিদারের ও গবর্ণমেণ্টের পাওনার নিমিত্ত তাহা সর্ব্বপ্রথম বাধ্য বিবেচিত হইবে।

(ঘ) প্রজা নিজের জমি যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

নীরা।

(গল্প)

শরতের সন্ধ্যাগমের অনতিপূর্ব্বে নদী-তীরবর্ত্তী উদ্যানে দাঁড়াইয়া কিশোরী নীরা সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত মেঘের দিকে চাহিয়াছিল। আর সেই নবীনার নব-সৌন্দর্য্য-বিভাসিত অপূর্ব্ব মুখের দিকে চাহিয়া ধীরেন তাহার প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল।

কোমল স্নেহপূর্ণ-স্বরে ধীরেন আবার প্রশ্ন করিল, "বল নীরা!" নীরার উন্নত দৃষ্টি এবার নত হইয়া ভূমি-সংলগ্ন হইল। কম্পিত কণ্ঠে সে উত্তর করিল, "তুমি ত সবই জান; নীরার হৃদয়ে যদি কেহ স্থান পায়, সে কেবল তুমি—"

ধীরেন ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "নীরা! তোমার কথা শেষ কর।"

তখন নীরার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল। সে সেই তৃণাসনে ধীরেনের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "মার্জ্জনা কর, তোমার নীরাকে মার্জ্জনা কর। —তুমি স্বর্গের দেবতা, আমি তুচ্ছ ধূলীকণা; তোমার চরণের রেণুরও যোগ্যা নহি, প্রভো! অবলাকে প্রলুব্ধ করিও না। আমি স্বর্গের দেবতাকে কোন্ প্রাণে ধূলার আসনে লুটাইব? আমি এ উন্মত্ত ভালবাসা চিরদিন বক্ষে লুকাইয়া জীবন কাটাইব। তুমি নীরাকে পরিত্যাগ কর—।" নীরার অশ্রুধারা কণ্ঠ-রোধ করিল।

ধীরেন সেই অবনত মুখ দুই হাতে তুলিয়া বক্ষে স্থাপন করিল; বস্ত্রে নীরার চক্ষু মুছাইয়া বলিল, "নীরা, আমিও তো জগতে আর কিছু চাহি না; শুধু তোমারই আশায় জীবন ধরিয়া আছি। বল নীরা, তুমি আমারই—।"

ধীরে ধীরে নীরা ধীরেনের বক্ষ হইতে মুখ উঠাইয়া একটু সংযত হইয়া বসিল। পরে সেই শান্ত স্থির নীল চক্ষু-দুইটি ধীরেনের মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা। কিন্তু তোমার বিবাহিত-পত্নীরূপে তুমি নীরাকে পাইবে না।"

বিস্মিত ধীরেন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

নীরা কহিল, "কেন! তুমি কি নীরাকে এতই হেয় মনে কর? তাহার এই ভালবাসা কি এতই নীচ, স্বার্থপরতাপূর্ণ মনে কর যে, সে নিজের সুখ-লালসায় তোমার সর্ব্বনাশ করিবে? মনে করিয়া দেখ, তুমি কে, আর আমি কে! তুমি রাজ্যেশ্বরের পুত্র, মাতাপিতা তোমারই মুখ চাহিয়া জগতে আছেন। তোমার সন্তানের উপর তোমার এই বিপুল বংশের সুখ-সম্মান নির্ভর করিবে। সেই তুমি যদি আজ অজ্ঞাতকুলশীলা মাতা-পিতৃহীনা দরিদ্রের গৃহে প্রতিপালিতা নীরাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যাও,—ভাবিয়া দেখ, সমাজ কোন্ খানে তোমায় স্থান দিবে! তোমার অবাধ-সুখময় গৃহের দ্বার চিরদিনের জন্য তোমার চক্ষে রুদ্ধ হইবে। তোমায় ভালবেসে নীরা শেষে রাক্ষসী সাজিবে!

বাধা দিয়া ধীরেন বলিল, "যাক্ নীরা, সব যাক্; আমি ত কিছুরই প্রত্যাশী নহি; কেবল তোমাকেই চাহি। পাষাণী, তোমার ভালবাসায় আমার ভালবাসায় অনেক তফাৎ। তুমি অনায়াসে আমাকে ফেলিয়া দিবে, কিন্তু চাহিয়া দেখ, তোমার জন্য আমার প্রাণ কি আকুল বেদনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! নীরা, কেন তোমায় দেখিয়াছিলাম—!"

নীরা বলিল, "সত্যই! কেন আমাদের দেখা হইয়াছিল, জানি না!"

তখন চন্দ্রদেব মাথার উপর অনেকখানি উঠিয়াছিলেন। নৈশ কুসুমকোরকগুলি ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতে-ছিল! বহুক্ষণ উভয়ে নিজ-নিজ চিন্তায় নিমগ্ন ছিল!—সহসা কে ডাকিল, "নীরা!" চকিত

হইয়া নীরা উত্তর করিল, "যাই—।" গমনোদ্যতা নীরার হস্ত ধারণ করিয়া ধীরেন বলিল, "কাল আবার দেখা দিবে ?"

উত্তরে নীরা কহিল, "দেখ, আমাদের আর বেশী দেখা হওয়া কি ভাল ? অবলার কতটুকু হৃদয়বল !—তাহাকে আর এরূপ করিয়া আঘাত করিও না।"

ধী। নীরা, জানি না, তুমি কি পাষাণে গঠিত ! কিন্তু তুমি যাহাই হও, ধীরেন তোমারই।

নীরা চলিয়া গেল।

রাত্রে পিতার আহারের নিকট বসিয়া নীরা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাদের বসন্তপুরের বাটী একেবারে কি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ?"

পিতা কহিলেন, "কেন রে ? সে খোঁজ তোর কেন আসিল ?"

নী। কি জানি বাবা ! এক জায়গায় ভাল লাগে না। দুই দিন কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে।

পিতা। গৃহাদি ভাঙ্গিলেই বা কি ! মা আর ছেলেটী ব্যতীত আর ত কেহ নাই ! ভিটের উপর একখানি কুটীর তুলিয়া কয়দিন কাটাইয়া আসিতে পারিব। কিন্তু সম্মুখে এমন নদীটি আর ফুলের বাগানটি ত আর নাই মা ! স্নান করিয়া আসিয়াই বৃদ্ধ গুরুর পূজার আয়োজন করিবে কিরূপে ? তাহার উপর জমীদার-বাটীর বিবাহটা দেখিয়া যাইবে না ?

নীরা কহিল, "ঐ বাবার মত ছুতা ! বাবা ! এখান হইতে এক পা নড়িতে চাহ না কেন, বল দেখি ?"

মুষ্টিবদ্ধ আহারের গ্রাস হস্তে রাখিয়া, বৃদ্ধ একবার স্নেহভরা সজল চক্ষুদুইটি নীরার মুখের দিকে তুলিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছ মা ! জগদম্বা এইস্থানে আবার নূতন করিয়া সংসার-বিরাগীর পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছেন কিনা ! তাই এখানকার মায়ার টান বড় বেশী হইয়াছে ! আচ্ছা মা, তোমায় লইয়া আমি একবার বসন্তপুর বেড়াইয়া আসিব।"

(২)

বৃদ্ধ কন্যাকে লইয়া বসন্তপুর যাত্রার আয়োজন করিলেন। প্রাতঃকালেই যাত্রার কথা। গ্রামের মাধব ঘোষের গো-যান ঠিক্ করা হইয়াছে। ধীরেন ইহা শুনিতে পাইয়া অতিপ্রত্যূষে নীরার নিকট আসিয়া বলিল, "নীরা ! এ কি !" ঈষৎ হাসিয়া নীরা উত্তর করিল, "কি হইয়াছে ?"

ধী। কি হইয়াছে ! যাওয়া হইতেছে কোথায় ?

কৌতুকপূর্ণ চক্ষু-দুইটি ধীরেনের মুখের দিকে ফিরাইয়া নীরা বলিল, "বসন্তপুর, বসন্তপুর !"

"নীরা, তুমিই সুখী ! তোমার অন্য চিন্তা, অন্য সুখ আছে ! হায় ! আমিই শুধু অভাগা ! জগতে আমারই আর কিছুই নাই !" এই বলিয়া অভিমানী ধীরেন দুই হাতে আপনার মুখ ঢাকিল। হাতের ফাঁক গলাইয়া অশ্রুজল বহিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া নীরা মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে মৃদুস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "একটি কথা বলি, সত্য উত্তর দিবে ?"

ধীরেন বলিল, "এতদিন পরে জানিলে কি আমি মিথ্যাবাদী !"

নীরা কহিল, "ভাবিলে ত বাঁচিতাম! তোমার এ কথার বাঁধনে আমায় শতপাকে আর জড়াইতে পারিতে না।"

ধী। তবে বল কি?

নীরা বলিল, "অমলার সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয় নাই কি?"

ধীরেন বলিল, "হইলেই বা? কে তাহাকে বিবাহ করিবে? আমার জগৎ একদিকে, আর তুমি নীরা,—তুমি একদিকে!"

সবিস্ময়ে নীরা বলিয়া উঠিল, "এ কি কথা!"

ধীরেনের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, "ঠিক্ কথা নীরা! সব ত্যাগ করিয়া তোমায় গ্রহণ করিব।"

দৃপ্তা ফণিনীর মত নীরা বলিয়া উঠিল, "কখনই নহে! তুমি যাও! আমায় আর ডুবাইও না। নীরা কখনও তোমার স্ত্রী হইবে না।"

নীরা ফিরিত, কিন্তু উন্মত্ত ধীরেন তাহার পায়ের উপর যখন আছাড় খাইয়া পড়িয়া কহিল, "নীরা! তুমিও বিমুখ হইলে!" হতভাগী তখন সেইস্থানে বসিয়া পড়িল ও অশ্রুসিক্ত মুখে ডাকিল, "উঠ উঠ।—নীরার তুমিই সর্ব্বস্ব।"

কাঁদিয়া ও কাঁদাইয়া নীরা ধীরেনের নিকট বসন্তপুর গমনের জন্য বিদায় লইল। কিন্তু দূরে আসিয়া এ কি কষ্ট! এ কি যাতনা! কিন্তু যাহাই হউক্ না, নীরা সকলই সহিয়া থাকিবে! ধীরেন তাহাকে ভুলুক্! ধীরেন কি তাহাকে ভুলিতে পারিবে? না।—কেন পারিবে না?—সে যে পুরুষ।

দারুণ মনঃকষ্টে দুইমাস কাটিয়া গেল। একদিন পিতা বলিলেন, "নীরা, আর ত মা, এখানে থাকা যায় না।" নীরা কহিল, "কেন বাবা?"

কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু সস্নেহ হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা কন্যা বড় হইলে পিতার কন্যা-দায় হয়, তাহা ত তুমি জান।"

নীরা কিয়ৎক্ষণ লজ্জিতার ন্যায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আমি জানিতাম আমার পিতার কন্যাই আছে, দায় নাই।"

পিতা হাসিয়া বলিলেন, "পাগল কোথাকার!"

নী। বাবা, একটা কথা বলিব?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "কি মা?"

নী। বাবা, তোমার মেয়ে ত অনেকদিন বড় হইয়াছে! আজ তোমার এত দায় হইল কিসে? আর তোমার যদি-বা দায় হইয়া থাকে, তোমায় এ কুড়ানো মেয়ে লইতে লোকের তো দায় নাই!

বৃদ্ধ কহিলেন, "এতদিন ছিল না; এখন লোকেরও দায় হইবে।"

উৎসুক ভাবে নীরা পিতার মুখের প্রতি চাহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "শোন মা! আজ কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, এই বসন্তপুরের ভিটায়, আমার সংসারের আপনার বলিতে যাহা কিছু, সকলই কালের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে আমি বাহির হইয়া পড়ি ও কেবল নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই। শেষে ধীরেনের পিতা তাঁহার গ্রামে আমাকে জমী দিয়া বাস করান। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিব ও অবশিষ্ট কাল তাঁহারই নামগুণ-গানে

কাটাইব, সংকল্প করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন মহামায়া তাঁহারই চরণের আশীর্ব্বাদের মত নদীগর্ভ হইতে তোমাকে তুলিয়া আমার হাতে সমর্পণ করিলেন। মা! সে-কথা সকলই তোমায় বলিয়াছি। তুমি তখন দুই-বৎসরের অনিন্দ্যসুন্দরী বালিকা! জলে পাইয়াছিলাম বলিয়া 'নীরা' বলিয়া তোমাকে ডাকিতাম। প্রথম প্রথম তোমার মাতাপিতার অনেক সন্ধান করিয়া, শেষে হতাশ হইয়া তোমার প্রতিপালনে আমি মন দিয়াছিলাম। দিবারাত্র আমার মনে জাগিত—"যাহার কেহ নাই, তাহারই সব" হইবার জন্যই জগন্মাতা বালিকারূপে আমার গৃহে আসিয়াছেন!"

বৃদ্ধ একটু চুপ করিলে, নীরা বলিল, "এ-সব তো শুনিয়াছি বাবা!" বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "হ্যাঁ মা, এইবার শেষটুকু বলি। আজ ৪।৫ দিন হইল, সংবাদপত্রে তোমার মাতাপিতার সন্ধান পাইয়াছি!"

নীরার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল! আকুল আগ্রহে সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "শোন মা, অত অধীর হইও না; তাঁহারা ইহ-সংসারে নাই। তবে তাঁহাদের পরিচয় জানিয়াছি। নীরা, তুমি সৎকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণ-কন্যা। তোমার পিতা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তোমার জনক-জননী তোমাকে লইয়া যখন ত্রিবেণীতে নৌকা করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, তখন তুমিই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান! দৈবক্রমে নৌকা ডুবিয়া যায় ও আমার এই স্থলপদ্ম-মাকে আমি কুড়াইয়া পাই! তোমার জননীরও, বোধ হয়, তাহাতেই মৃত্যু হয়; কেন না, তাঁহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তোমার পিতা অনেক কষ্টে প্রাণ লইয়া কর্ম্মস্থানে যান ও তোমাদের সন্ধান করেন, কিন্তু নিরাশ হইয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি অগাধ সম্পত্তি ও একমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। যদি প্রথমা স্ত্রী বা কন্যা জীবিতা থাকে, এই ভাবিয়া তোমাদের জন্যও তিনি সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তোমার সেই বৈমাত্র্য ভ্রাতাই এখন তোমার সন্ধানে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন।"

নীরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কাজ কি পিতা, আর সম্পত্তিতে! পিতার অভাব আমার নাই; তবে যদি মাকে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও বা আবার পুরাতন সম্পর্ক ধরিয়া লইতাম। যখন সে সবই গিয়াছে, তখন আমরা যাহা আছি তাহাই ভাল।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তাহাও কি হয় মা! আমি আর কয় দিন! নীরা! তোমায় উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া সুখী দেখিলেই, আমি নিশ্চিন্তে শ্রীহরির চরণে আশ্রয় লইতে পারিব।"

এইবার নীরার চক্ষে জল আসিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

বৃদ্ধ কন্যার মস্তকের উপর সন্তর্পণে হাত রাখিয়া বলিলেন, "মা! একটি কথা বলি, লজ্জা করিও না; যথার্থ উত্তর দাও। মা, আমি অনেক দিন হইতে অনুমান করিতেছিলাম যে, তুমি ও ধীরেন পরস্পরের প্রতি অনুরাগী। এটা কি যথার্থ?"

নীরা কোনও উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মুখ মাটির দিকে নত হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "মা, সে অতিশয় অসম্ভব কাণ্ড বলিয়া, আমি দেখিয়া শুনিয়াও উদাসীন ছিলাম; কিন্তু এখন তোমার যাহা পরিচয় জানিয়াছি, তাহাতে তুমি জমীদার-বধূর অযোগ্যা নও! কিন্তু মা! বিধাতার অন্য ইচ্ছা! ধীরেনের সহিত রজনীর কন্যা অমলার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে; আর এক পক্ষ পরেই বিবাহ হইবে।

কন্যাকে আরও কাছে টানিয়া তিনি বলিলেন, "মা! তোমার মূর্খ পিতার যতটুকু সামর্থ্য ছিল, তোমায় শিক্ষা দিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই। দেখ মা, তুমি যদি ধীরেনকেই পতি ভাবিয়া থাক,—এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী পুত্রের তুমি তাপসী মা—সুতরাং, ইহাতে ভোগের কামনায় তোমার পবিত্র প্রাণ নিশ্চয়ই কাতর হইবে না!"

নীরা তখন মনে মনে বলিল, 'তাহাই বল পিতঃ, যেন তোমার উপযুক্ত কন্যা হইতে পারি।'

(৩)

নীরা যখন পিতার সহিত গ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন জমীদার-বাটীর বিবাহের গোল একেবারে থামিয়া গিয়াছে। বধূর রূপ, গুণ ও অলঙ্কারের কথা এবং আহারের পারিপাট্যের বর্ণনা লোকের মুখে মুখে চলিতেছিল মাত্র। নীরা ভাবিল, "বাঁচিলাম! ধীরেনের সঙ্গে আর দেখা হইবে না। অমন পত্নী পাইয়া ধীরেন নিশ্চয়ই সুখী হইয়াছে। একটু হাসিয়া সে ভাবিল, ধীরেন এই প্রেমের এত গর্ব্ব করিত!

পরদিন তখনও জগতে ভাল করিয়া আলোক ফুটিয়া উঠে নাই! প্রভাত গগনে উষার নবীন আভা ধীরে-ধীরে দেখা দিতেছিল। সুশীতল বায়ু তড়াগ-সলিলে বীচিমালার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে তালে-তালে নাচাইতেছিল! দুরন্ত বালকের দলের মত পাখীর ঝাঁক আকাশ-গাত্রে উড়িয়া উড়িয়া গান গাহিতেছিল! নীরা স্নান করিয়া কূলে উঠিয়াই দেখিতে পাইল, কে যেন তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিতেই নীরার বক্ষের রক্ত জল হইয়া গেল। সেখান হইতে সে আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না; মাটির দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল।

ধীরেন নিকটে আসিয়া ডাকিল, "নীরা! এতদিনে ফিরিলে! কি পাষাণী তুমি! একবার মুখ তোল, নীরা! আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।"

নীরার প্রথমে বাক্য সরিল না, ধীরেনের সেই আকুল-বাণী তাহার অবোধ মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত-পরেই সে সচেতন হইয়া উঠিল। নিম্নদৃষ্টি ধীরেনের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "তুমি এখানে কেন? আমাকে দেখিতে আসিয়াছ! তোমার পরিণীতা পত্নীকে গৃহে ফেলিয়া তস্করের মত পর-নারীর অনুসরণ করিতেছ! পথ দাও, আমি গৃহে যাই।"

বিস্মিত ব্যথিত ধীরেন ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "ভুল! ওঃ—কি ভুল বুঝিয়াছি! নীরা আমায় ভালবাসে! নীরা, প্রেম কি যদি জানিতে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যদি কাহাকেও হৃদয় সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে আজ আমায় এরূপ করিয়া দূর করিতে পারিতে

না—সংসারের কঠোর কর্ত্তব্যের আজ্ঞায়! তাহার প্রতি কর্ত্তব্য-পালন তাহাও তাহারই আজ্ঞায়! কিন্তু এ উত্তাল হৃদয়াবেগ সংযত করিব কাহার আজ্ঞায়? প্রেমের এ মন্দাকিনীর বেগের নিকট সংসারের সকল শক্তি যে ভাসিয়া যায়, নীরা! নীরা, একবার চক্ষের দেখা, তাহাও দিবে না?"

হায়! অভাগীর বুকের ভিতর রুদ্ধ রোদন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল! মৃদুস্বরে অনেক কষ্টে কণ্ঠ খুলিয়া নীরা উত্তর দিল, "না—।"

ধী। আচ্ছা, তাহাই ভাল! কিন্তু নীরা, জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখনই এমন হইলে? না, চিরকালই এইরূপ ছিলে? আমি কি নিজের স্বপ্নের প্রমাদে বিভোর হইয়া তোমায় প্রেমের রাণীরূপে দেখিয়াছিলাম? বল, নীরা, একদিনও কি তুমি আমায় ভালবাস নাই?

কত সহে! অবলার দুর্ব্বল হৃদয়ে কত সহে! নীরা আর পারিল না। ধীরেনের পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, "ক্ষমা কর, ধীরেন! ক্ষমা কর! প্রেম উত্তাল নহে, প্রেম অসংযত নহে, প্রেম ক্ষণভঙ্গুর নহে! তুমি অমলাকে বিবাহ করিয়াছ; তাহাকে লইয়া চির-সুখী হও! কিন্তু আমার চক্ষের সম্মুখ হইতে তুমি সরিয়া না যাইলে, আমার কি হইবে! আমাকে আর প্রলোভন দেখাইও না। তোমারই চরণ সাধনা করিয়া আমায় জীবন কাটাইতে দাও; প্রেমের অমর্য্যাদা করিতে দিও না!—আমার ভালবাসায় তোমার সংসার যেন বিষ না হয়!" নীরার চক্ষে অশ্রুধারার পর অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ধী। তাহাই হইবে নীরা! হতভাগা ধীরেন আর তোমায় দেখা দিবে না। কিন্তু হয় ত, দিনান্তে একবারও সে গোপনে তোমার অজ্ঞাতে তোমায় দেখিয়া যাইবে! নীরা, তাহাতে বঞ্চিত করিলে, ধীরেন আর বাঁচিবে না।

(৪)

সেই শান্তিপূর্ণ নির্জ্জন কুটিরের দ্বারে একদিন কালের ভেরী বাজিয়া উঠিল। নীরার বৃদ্ধপালক সংসারের কাছে সকল হিসাব চুকাইয়া অনন্তপথে যাত্রা করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে পদতলে আসীনা রোদনরতা কন্যাকে আশ্বাস দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা, মানুষ কখনই আশ্রয়হীন একাকী হয় না! সেই অসহায়ের সহায় সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বদাই আমাদের রক্ষক আছেন। মা, তাঁহার নাম-গানে কখনই বিরত হইও না। যদি কখনও আত্মীয়ের আশ্রয়ের আবশ্যকতা হয়, তোমার ভাই আছেন, সেখানে যাইও। রামচরণ রহিল, বাল্যে সে তোমায় বক্ষে করিয়া পালন করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্তে ইহার উপর নির্ভর করিতে পার।"

কিন্তু সকল কথা জানিলেও মন মানে কই? সেই চিরস্নেহময় চিরাশ্রয় পিতার অভাবে আজ জগৎ যেন নীরার শূন্য অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল! যে চিরদিন নির্ভরশীলতায় দিন কাটাইয়াছে, আজ ভীতিপ্রদ সংসারের উত্তপ্ত বালুকাতে সে কি করিয়া দেহ-প্রাণ রক্ষা করিবে! হায়! অভাগিনী নীরা আজ কাহার মুখে চাহিবে! শূন্যগৃহে শূন্য হৃদয় লইয়া ভূমিতে লুটাইয়া লুটাইয়া যখন নীরা কাঁদিতেছিল, তখন একখানি স্নেহকোমল হস্ত ধীরে ধীরে নীরার ললাট স্পর্শ করিল। সে স্পর্শ কি মধুর,—কি স্নেহময়! নীরার এত যে দুঃখ, এত

যে কষ্ট, সব যেন সেই স্পর্শের মধ্যে লুকাইতে চাহিল! ধীরেন ডাকিল,- "নীরা!" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখে তাহা বাধিয়া গেল। সেদিন নীরা ধীরেনকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। ধীরেনের পদযুগলের ভিতর মুখ লুকাইয়া প্রাণ ভরিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! হায়! এ চরণ-দুইটি যে নিরাশ্রয়ার মহান্ আশ্রয়! ইহা তাহার যে চির-ঈপ্সিত স্বর্গ! আজ কি নীরা এ চরণ ছাড়িতে পারে!!

ধীরেন ধীরে ধীরে বলিল, "নীরা, এইবার আমাদের গৃহে চল। এখানে একাকিনী কি করিয়া থাকিবে?"

নীরা অসম্মত হইয়া বলিল, "তাহা হইতে পারে না! পিতার এই আশ্রমটুকুতে পড়িয়াই দিন কাটাইব।"

ধী। নীরা! এখন তুমি একাকিনী! তাহার উপর তুমি স্ত্রীলোক! তোমার পিতার যাহা আছে, তাহাতে তোমার গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে সত্য! কিন্তু আমি দাস-দাসী রাখিয়া দিই; নতুবা তোমায় দেখিবে কে?

নীরা মৃদুস্বরে দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না। আমার কিছুরই আবশ্যকতা নাই। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি সন্ন্যাসিনী! কিন্তু তথাপি দেখ, মন কি দুর্দ্দমনীয়! আজ তোমায় দেখিয়া আর মনকে বাঁধিতে পারিলাম না। তুমি আমাকে বিস্মৃত হও, নতুবা সংসারে সুখ পাইবে না; সুখদুঃখে যাহাকে জীবনের সঙ্গিনী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আনিয়াছ, তাহারও প্রতি অন্যায় করিবে! আমাকেও তোমায় ভুলিতে দাও, আর আমার কাছে আসিও না! দেখ, এ হৃদয় বড়ই দুর্ব্বল! তুমি বড় লোভনীয় বস্তু! এ হতভাগ্যা নারীর সর্ব্বনাশ করিও না।" ধীরেন নীরবে চলিয়া গেল।

হায়, দারুণ দর্প কোথায় রহিল! নীরা যে আর পারে না। এখন দারুণ শোকে ও দুঃখে নীরার সেই দুঃখহারী মুখটী সম্মুখে সে জাগিয়া উঠে! যখন পিতার সঙ্গহীনতায় প্রাণ আকুল হয়, তখনই ধীরেনের সঙ্গ পাইবার জন্য তাহার ক্ষুধিত প্রাণ যে হাহাকার করিয়া উঠে! একবার সেই মুখখানি দেখিলে যেন নীরার সকল যাতনার শান্তি হয়! কিন্তু সে কেমন করিয়া তাহা হইতে দেয়? ধীরেনের সাধের সংসারে কি নীরা আগুন লাগাইবে! কিছুতেই না! তাহার এ নারীজীবন পণ করিয়া সে সংগ্রাম করিবে।

নাঃ! আর চলে না! শেষে কি নীরা পাগল হইয়া যাইবে? সে রামচরণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিল, সে গ্রাম ছাড়িয়া তাহার ভ্রাতার নিকট চলিয়া যাইবে; রাসচরণ পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

(৫)

নীরা তাহার ভ্রাতার নিকট আসিল। তখনও গৃহে বধূ-সমাগম হয় নাই; সুতরাং, গৃহস্থালীর কাজ অনেক। বসাবাটী যখন গোছান-গাছান একরকম হইল, তখন সে ভ্রাতার বিবাহের তাগাদা আরম্ভ করিল! ছোট ভাই!—কি মিষ্ট জিনিস! নীরার যে বুক কেবলই খাঁ খাঁ করিত, ভ্রাতৃস্নেহে আজ নীরা তাহাতে অনন্ত অক্ষয় তৃপ্তি আস্বাদন করিল! শৈশবে মাতৃহীন, অধুনা পিতৃহীন, ললিতও এই ভগিনীর স্নেহনীড়ে ধরা দিল!

হায়! স্নেহাতুর প্রাণ যে কেবলই আশ্র-

চাহে! যখন গৃহকার্য্যে অবকাশ পাইত, তখনই নীরা বাটীর নিকটবর্ত্তী বালিকা-বিদ্যালয়টিতে গিয়া বসিত। সময় সময় সে বালিকাদিগকে শ্লোক শিখাইত। কখনও বা আবশ্যক হইলে, কোনও শিক্ষয়িত্রী নীরার উপর ভার দিয়া দুই দিন ছুটি লইতেন। কর্ম্মহীন জীবন অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই! এখন নানা-কর্ম্মের মধ্যে নীরা নিঃশ্বাস ফেলিল।

একবৎসর পরে গৃহে নববধূ আসিলে নীরার কাজ আরও বাড়িল। এইবার নীরা নিশ্চিন্ত হইল; ধীরেনকে, বুঝি, সে ভুলিতে পারিবে।

এইভাবে ক্রমে চারি বৎসর কাটিয়া গেলে ধীরে ধীরে নীরার হৃদয়ে আবার মেঘ দেখা দিতে লাগিল। এই স্নেহময় ভ্রাতৃগৃহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার অনন্ত ভালবাসা নীরার অন্তরে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতে লাগিল। সকল হৃদয় ব্যস্ত করিয়া শুধু একখানি মুখ ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! সে মুখে যেন অনন্ত প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতেছে!—করুণ চক্ষু-দুইটি যেন অশ্রুতে ছল্-ছল্ করিয়া নীরারই পথ চাহিয়া আছে! নীরার শ্রবণে অবিরত বাজিতে লাগিল, যেন কে ডাকিতেছে—"ফিরে এস নীরা, একবার ফিরে এস। পাষাণী—একবার দেখা দিয়া যাও।"

নীরা প্রথম প্রথম মনকে দমন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু নদীতে যখন জোয়ারের বেগ আসিতে থাকে, মানুষের শত চেষ্টায় কি তাহা রোধ করা যায়? নীরার সুপ্ত প্রেম দিনে দিনে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। শুধু একটিবার চোখের দেখা দেখিবার জন্য নীরার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল। একদিন ললিতকে ডাকিয়া নীরা বলিল, "আমায় একটী লোক ঠিক্ করিয়া দাও, আমি একবার হরিনাথপুর যাইব।" ললিত বিস্মিত হইয়া বলিল, "সেই পোড়ো ঘরে যাইবার জন্য আবার সাধ হইল কেন, দিদি?"

নী। ললিত, পোড়ো হো'ক, আর যাই হোক্, তাহার মায়া কি আমি ছাড়িতে পারি? আমার মন ভারি চঞ্চল হইয়াছে। অনেক ভাবিয়া কিছুতেই মনকে বুঝাইতে না পারিয়া তবে তোমাকে বলেতিছি।

ল। একান্তই যাইবে?

নী। হাঁ ভাই!

ল। শীঘ্র ফিরিবে তো?

নীরার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে বলিল, "ললিত, অভাগীর আর কে আছে? তোমাদের ছেড়ে কতদিন থাকিব?"

(৬)

নীরা পূর্ব্বগৃহে ফিরিয়া দেখিল, সত্যই তাহা পতনোন্মুখ। তাহার পিতার স্বহস্ত-রোপিত পুষ্পোদ্যান কণ্টক-বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কেবল কলনাদিনী স্রোতস্বিনী তেমনই বহিয়া যাইতেছে!

নীরা প্রথমেই রামচরণকে ডাকিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল; তাহার পর ধীরে ধীরে জমীদার-বাটীর সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

যথাযথ উত্তর দিয়া রামচরণ কহিল, "দিদি জমীদার-বাটীর সংবাদ আর কি বলিব! কর্ত্তা ও গৃহিণী স্বর্গে যাইবার পর মা লক্ষ্মীর কি কুদৃষ্টি যে পড়িয়াছে, জানি না!"—

নী। কেন রে? কি হইল?

রা। ধীরেনবাবুর দুরবস্থার শেষ নাই! আজ ছয়মাস হইল বিসূচিকায় তাঁহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীটী মারা গিয়াছেন।

নীরার প্রাণ যথার্থই কাঁদিয়া উঠিল। সে বিস্ময়-ব্যথিত কণ্ঠে বলিল,—"এঁ্যা! বলিস্ কি!"

রামচরণ কহিল, "শুধু তাহা নহে! সেই কষ্টের উপর আজ দুই মাস হইল, ধীরেনবাবুর শয়নগৃহের চারিদিকে এমনভাবে আগুন ধরে যে, তাঁহার বহির্গত হইবার পথ থাকে না। তিনি জানালা দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়েন।"

রুদ্ধশ্বাসে নীরা জিজ্ঞাসা করিল, "রক্ষা পাইয়াছেন তো?"

রা। যে-ভাবে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহার অপেক্ষা না পাওয়াই ভাল ছিল।

নীরার কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না; সে কেবল ব্যাকুল দৃষ্টিতে রামচরণের মুখের দিকে চাহিল!

রামচরণ কহিতে লাগিল, "এত কষ্ট করিয়াও আগুনের হাত এড়াইতে পারিলেন না। যেখানে লাফাইয়া পড়েন, তখন সেখানে খুব আগুন। তাঁহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হয় ও তিনি অজ্ঞান হন। তখন পাঁচ-জন গিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া আসে। এখনও পোড়া ঘায়ে তিনি শয্যাগত আছেন। জান-পাখানি একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার উপর দেখিবার শুনিবার লোক কেহ নাই। সেই-বংশের দুলাল আজ কত কষ্ট পাইতেছে, ভাবিলে আমাদেরই চক্ষে জল আসে!"

নীরা আর কথা কহিতে পারিল না। বর্ষার নব মেঘমালা সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নীরার সুবিশাল সুনীল চক্ষুতারকা-দুইটীতে, আকাশভ্রমে বুঝি, নামিয়া আসিতে-ছিল। সহসা নীরার নয়ন হইতে তুষারপাতের ন্যায় দুই-চারিবিন্দু অশ্রু পতিত হইল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে অশ্রুবৃষ্টি আরম্ভ হইল। নীরা বুঝিল, আজ কয়মাস হইতে কেন তাহার মন এমন করিয়া তাহাকে আক-র্ষণ করিতেছিল!

বাহিরের আকাশে তখন ঘনঘটা। পৃথি-বীতে গাঢ় অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছিল। পথঘাট শূন্যময়;—দেখিবার উপায় নাই। মুষলধারায় বৃষ্টিও পড়িতেছিল। সেই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া বারিধারার মধ্য দিয়া ক্ষণপ্রভার মন্দ আলোকে পথ দেখিয়া দেখিয়া অস্থিরপ্রভার ন্যায়ই নীরা ত্বরিত চরণে জমীদার বাটীতে উপস্থিত হইল।

অতিধীর-পাদবিক্ষেপে সে ধীরেনের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ধীরেন রোগশয্যায় পড়িয়া আছে। ধীরেনের চক্ষু মুদ্রিত ছিল; সে নীরাকে দেখিতে পাইল না। সন্তর্পনে নীরা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুনিল, শুষ্ককণ্ঠে ধীরেন কহিতেছে, "উঃ মাগো! বড় তৃষ্ণা!"

নীরা কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে ধীরেনের শুষ্ক জিহ্বায় তাহা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "এই যে দুধ! খাও দেখি!" চমকিত হইয়া ধীরেন চক্ষু মেলিল। সম্মুখে কেহই নাই। নীরা তখন শয্যানিম্নে বসিয়া গ্লাসে দুধ ঢালিতেছিল। ধীরেন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "শেষে পাগলও হইব! হা ভগবন্! সত্যই যদি এ সময় এক-বার তাহাকে দেখিতাম! উঃ বড় তৃষ্ণা! কে আছ?" কম্পিতকণ্ঠে নীরা পুনরায় বলিল, "দুধ খাও!" ধীরেনের এবার চোখে জল আসিল। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "কেন এ কষ্টের উপর কষ্ট দাও, ঠাকুর! এ কি

তাহাকে ভালবাসারই প্রায়শ্চিত্ত! উঃ! কে তুমি দুখ আমায় দাও?"

নীরা ধীরে ধীরে গ্লাসটী মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, "খাও।" কথা কহিতে তখনও নীরার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইয়া দিলে ধীরেন মুদিত চক্ষে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? নীরাও কি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে! আজ কি তাহারই আত্মা আমায় দেখিতে আসিয়াছ? দেখিতে আসিয়াছ কি যে, এই দেহের যন্ত্রণার উপর ব্যর্থ প্রেম কি করিয়া আমায় দগ্ধ করিতেছে! দেখিতে আসিয়াছ কি, আজ সব বিসর্জ্জন দিয়াও কি করিয়া তোমার স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া দগ্ধ হইতেছি! জীবনে পাষাণী ছিলে, মরণেও কি সে রীতি ছাড় নাই?"

তখন ধারার উপর ধারা আসিয়া নীরার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছিল। শত চেষ্টাতেও কণ্ঠে স্বর বাহির হইল না। সে ধীরে ধীরে ধীরেনের ক্লিষ্ট হাতখানি নিজের হাতের ভিতর তুলিয়া লইয়া অতিধীরে তাহাতে নিজের স্ফুরিত অধর স্পর্শ করিল।

তখন ধীরেন চোখ খুলিয়া নীরার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে সে অতি-তৃপ্তির একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার পর তেমনি ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি যতই নিষ্ঠুর হও নীরা, কিন্তু তোমার স্মৃতি বড় মধুর! তোমার প্রকৃতি বড় সুন্দর! আঃ!—দেখ, আমার বুকের জ্বালা আজ কত নিভিয়া আসিয়াছে! কিন্তু তুমি না আসিলেই ভাল করিতে। আবার যখন চলিয়া যাইবে, তখন সে জ্বালা যে আরও বেশী হইবে!"

কাঁদিতে কাঁদিতে নীরা বলিল, "কোথা যাইব! ওই চরণ ছাড়া নীরার জগতে স্থান আর কোথায়!"

ধীরেন কিছু ক্ষণ একদৃষ্টে নীরার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; শেষে নিজ-মনে অতি-মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিল, "নীরা আমায় সত্যই ভালবাসে।"

নীরা কোমল কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মাথায় একটু বাতাস দিই? ঘুম আসিবে কি?"

ধী। আঃ! আজ একটু তৃপ্তিতে ঘুমাইব।

আহার-নিদ্রা-পরিত্যক্তা নীরার অক্লান্ত সেবা সার্থক হইল। ধীরেন সুস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার দক্ষিণ পদটি খঞ্জ হইয়া গেল। নীরার সাহায্য লইয়া সে একটু একটু বেড়াইতে লাগিল। একদিন প্রদোষকালে ছাদে বেড়াইতে বেড়াইতে নীরা বলিল, "একটি কথা আছে।" ধীরেন ভীতভাবে নীরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলিবে?—বাওয়ার কথা নাকি?"

নী। না। থাকিবারই কথা।

ধীরেন বিস্ময়ানন্দে নীরার মুখের দিকে চাহিলে, নীরা বলিল, "যদি চিরদিনের জন্য চরণে স্থান দাও! তাহা না হইলে, এভাবে তো শুধু থাকা যায় না!"

হাসিয়া ধীরেন উত্তর করিল, "ওঃ, বুঝিয়াছি। পুরোহিত আহ্বান?"

নীরা লজ্জিতা হইয়া মুখ নত করিল।

ধীরেন আবার কহিল, "যখন সাধিয়াছিলাম তখন গুমোর হইয়াছিল। এখন এই আগুনে পোড়া খোঁড়াকে, বুঝি, বড় পছন্দ হইল?"

নীরা হাসিয়া উত্তর দিল, "সোনা পুড়িয়ে খাঁটি করে নিয়েছি; এইবার হার করে বক্ষে ধারণ করব।"

শ্রীননীবালা দেবী।

সূর্য্যের প্রতি সূর্য্যমুখী।

আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ফুল, তুমি মহীয়ান্,
তবু তোমা পানে ধায় আকুল পরাণ!
লোকে বলে সূর্য্যমুখী সূর্য্য-সোহাগিনী;
তারা ত জানে না মম গোপন-কাহিনী!
কি মোহ-মন্ত্রের বলে আমার জীবন চলে,
আমায় চালায় কোন্ শক্তি সঞ্জীবনী,—
পরে কি বুঝিবে, আমি নিজে যা' বুঝি নি!

আমি ক্ষুদ্র অণুকণা, তুমি প্রভাকর!
তোমাতে আমাতে প্রভু, অনেক অন্তর!
বহু উর্দ্ধে বহুদূরে তুমি থাক সুরপুরে,
আমি ফুটি ক্ষুদ্র ফুল মাটির উপর!

অতৃপ্ত তৃষিত আঁখি, সারাবেলা চেয়ে থাকি,
তবুত মেটে না তৃষা;—বিরহে তোমার
জগৎ আমার চোখে শূন্য অন্ধকার!
তুমি রবি, অর্দ্ধ-প্রাণ বিশ্ব-জগতের;
তোমার করুণা মাগি দিবস রয়েছে জাগি,
ব্রহ্মাণ্ড হিসাব রাখে উদয়-অস্তের!

হে অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়, বুঝিবে কি তুমি—
কি মহান্ দিব্য সুখে মগ্ন রহি আমি!
সাধকে কি সিদ্ধি-তরে ইষ্টদেবে পূজা করে?
শুধু কি পূজায় তৃপ্তি হয় না-ক তার?—
চির-সাধনার সিদ্ধি পূজাতে আমার!
জান না আমায় তুমি, জানাতে না চাই;
আমি যেন যুগেযুগে এই সুখই পাই!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

লীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

২৭

লীলা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল; শয্যা ত্যাগ করিয়া বসিবার কক্ষে আসিতে লাগিল। সুব্রত তখনও সেই হোটেল পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। যখন ডাক্তার-সাহেব বলিলেন যে আর কোনও ভয় নাই, তখন সুপ্রকাশ গাড়ী 'রিজার্ভ' করিবার জন্য লিখিলেন। লীলা দুই-একটি কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিত, কিন্তু সুপ্রকাশ তাহাকে তাহা করিতে দিতেন না। সুব্রতও আর সুপ্রকাশের বসিবার কক্ষে আসিতেন না; সুপ্রকাশই গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিতেন। যাত্রার দিবস পূর্ব্বাহ্নে লীলা একখানি আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া ছিল, এমন সময় সুপ্রকাশ তাহার কাছে গিয়া বলিলেন, "লীলা, তোমার সঙ্গে একজন দেখা কর্‌তে চান!"

লীলা বলিল, "কে?"

সুপ্রকাশ। সুব্রত এখানেই আছেন। আমার সঙ্গে প্রত্যহই তাঁর দেখা হয়। তিনি আজ চলে যাবেন। তাই দেখা কর্‌তে চান্। তোমার অসুখের সময় তিনি যথেষ্ট সাহায্য কোরেছেন। সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে থাকতেন।

শীলা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিল; তাহার পর বলিল, "তবে কি সুব্রত বসুর সঙ্গে আমার সত্যিই দেখা হয়েছিল? তিনি যে তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিলেন! আমি ভেবেছিলুম সে-সব স্বপ্ন, তাই তোমায় কিছু বলি নি।"

সুপ্রকাশ। সেই সব কথার জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা কোরে ক্ষমা চাইবেন; তাই দেখা করতে চান্।

শীলা কাতর দৃষ্টিতে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আবার এসে ও কিছু বল্‌বেন না! আমি আর সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বাহিরে গিয়া সুব্রতকে ডাকিলেন। সুব্রত ও শৈলেন উভয়েই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুব্রত শীলার সম্মুখে আসিয়াই বলিলেন, "আপ্‌নি আমায় ক্ষমা করুন্। আমি অনর্থক মিঃ রায়ের নামে কতকগুলি অপবাদের কথা বলে, আপ্‌নার কাছে বিশেষভাবে দোষী হয়িছি। আমি যা বলেছিলাম সবই অন্যায় বলিছি; না জেনে অপরাধ করিছি। ক্ষমা করুন্।"

শীলা ব্যাকুলনেত্রে সুপ্রকাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, "তবে কি আমার স্বপ্ন সত্য! মিঃ বসু কি আমায় এসে বলেছিলেন যে, তোমার নামে 'কেস্' হয়েছিল? তুমি মিসেস্ দাসকে—?"

শীলার কথার শেষ না হইতেই শৈলেন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "সুপ্রকাশ-দার নামে 'কেস' হয় নি; 'কেস' আমার নামেই হয়। মিসেস্ দাস বাইরে আছেন, তাঁর সাম্‌নেই সব বল্‌ছি শুন্‌বেন্।"

শীলা ব্যস্তভাবে বলিল, "না না; তাঁকে আর ডাক্‌বেন না।"

সুপ্রকাশ। শীলা, ডাক্‌তে দাও! এতে ভালই হ'বে!

শৈলেন বাহিরে গিয়া মিসেস্ দাসকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। শীলা দেখিল, তাহার মাতার সমবয়স্কা পক্ককেশা আরক্ত-বার্দ্ধক্যা ঘোরতরকৃষ্ণবর্ণা একটী রমণী অগ্রসর হইয়া আসিলেন। শৈলেন পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য শীলাকে দেখাইয়া মিসেস্ দাসকে বলিলেন, "—মিসেস্ রায়!"

মিসেস্ দাস সম্ভ্রমের সহিত মস্তক নত করিয়া করজোড়ে শীলাকে প্রণাম করিলেন। শীলা এত বিস্মিত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে বসিতে বলিতে ভুলিয়া গেল। শৈলেন তাঁহাকে একখানি বেত্রাসনে বসিতে বলিয়া, শীলাকে বলিলেন, "বৌদি! ইনিই মিসেস্ দাস।" তাহার পর পূর্ব্বাপর সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিয়া শৈলেন আপনার প্রিয়তমা পত্নী সুষমার বিচিত্র সন্দিগ্ধতার বিবরণ, এবং এই সন্দিগ্ধতা-হেতু তাহার নিকট এই সকল ব্যাপার গোপন করিয়া রাখিবার জন্য মিসেস্ ব্যানার্জ্জির উপদেশ, অল্পবয়স্ক শিশুটীর মৃত্যু প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখপূর্ণ সাংসারিক অবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শীলা একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, আপ্‌নার আর বল্‌তে হবে না। এ কথার আর আবশ্যকতা নাই।" তাহার পর মিসেস্ দাসকে সে বলিল, "আপ্‌নি বসুন! দাঁড়িয়ে কেন?"

শীলার নিকটে যাইয়া, শীলাকে নমস্কার করিয়া মিসেস্ দাস বলিলেন, "আপ্‌নার স্বামীর দয়াতেই বেঁচে আছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ থেকে এদেশেই আছেন। আমি এখানেই

হাঁসপাতালে কাজ কর্‌তাম। সেই ঘটনার পর আমার কাজ গিয়েছে। আপ্‌নার স্বামী দয়া করে মাসে মাসে যে কুড়িটি টাকা দেন, আর আমি একটু আধ্‌টু যা কাজ পাই, তাতেই কোন রকমে চল্‌ছে। আমার মা চলচ্ছক্তি-রহিত। আমার দু'টি সন্তান; তাদের একটি কালা-বোবা; আর একটী খঞ্জ, চলিতে পারে না। আমি যে কি-ভাবে জীবন কাটাই, তা জগদীশ্বরই জানেন্‌! আপ্‌নাদের দয়া না হ'লে আমার বাঁচ্‌বার, বোধ হয়, কোনও উপায় ছিল না!"

মিসেস্‌ দাসের কথা শুনিয়া শীলার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। শীলা তাঁহাকে পুনরায় বসিতে বলিল।

সুপ্রকাশ এইবার শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "সকলকার জন্যে চা আন্‌তে বলি? —সুব্রত আজই চলে যাবেন।"

স্বামীর সহিত সুব্রতর এরূপ ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া শীলা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গেল! সুপ্রকাশ বেহারাকে ডাকিলেন ও মিসেস্‌ দাসকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শৈলেন নতমুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি চাহিয়া শীলার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটুও ছায়া যেন শীলার ভাল লাগিতেছিল না। স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বাঁচিয়া থাকা, কি ভীষণ অবস্থা!—তাহা ভাবিতেও তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছিল! সহসা শীলার দৃষ্টির সহিত সুপ্রকাশের দৃষ্টি মিলিত হইল। শীলা সেই দৃষ্টিতে শুধু গভীর অনুরাগ দেখিল! সে-মুখে শুধু উদারতা ও প্রসন্নতা বিরাজিত রহিয়াছে! এই স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস! শীলার আপনাকে কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হইতে লাগিল!

বেহারা চা-পানের দ্রব্যাদি আনিলে, শীলা মিসেস্‌ দাসকে চা দিতে গেল। তিনি লইলেন না; বলিলেন "আমায় ক্ষমা কোর্ব্বেন; আমি চা খাই না।" তাহার পর নমস্কার করিয়া বিদায় লইয়া তিনি স্বগৃহাভি-মুখে চলিয়া গেলেন।

শৈলেন ও সুব্রত চা পান করিলেন। সুব্রত তখনি যাইবেন। তিনি শীলাকে বলিলেন, "আবার কটকে দেখা হ'বে। আপ্‌নারা ত লক্ষ্ণৌ হয়ে যাবেন্‌? আমি কটকেই 'প্রাক্‌টিস্‌' কোর্ব্বো স্থির করিছি। আশা করি, আপ্‌নি আমার অপরাধ সব মাপ্‌ কোরে আমাকে নিজের ভাই বলেই মনে কোর্ব্বেন।"

যাঁহার প্রতি শীলার মনের ভাব অন্য-প্রকার ছিল, আজ তাঁহারই কথায় তাহার মন আর্দ্র হইয়া গেল! শীলা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপ্‌নার মাকে, বৌদিদিকে আমার নমস্কার দেবেন। আপ্‌নার বৌদিদিকে বল্‌বেন যে, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে সুখী হ'ব। তিনি আমাকে বোনের মত ভাল বাসেন, বলেছিলেন। যেন এইবার তা স্মরণ কোরে, আবার সেই-ভাবেই দেখেন্‌!"

সুব্রত। বৌদিদি নিজেই ব্যস্ত হবেন! আপ্‌নার কথা তিনি বাটীতে প্রায়ই বলেন। আপ্‌নাদের দেখা-সাক্ষাতে আর কোন বাধা থাক্‌বে না। মাসীমারাও সেইখানে আছেন। তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে যান।"

শীলা। রমা কোথায়?

সুব্রত। (নতমুখে) তিনিও সেইখানে আছেন।

দুই-একটী কথার পর সুব্রত শীলার নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে দ্রব্যাদি তুলিয়া দেওয়া হইল। শৈলেন ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইবেন; সুতরাং তিনিও গাড়ীতে উঠিলেন। সুব্রত যাইবার সময় সুপ্রকাশের কর-মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে কত রকমে কষ্ট দিলাম! ক্ষমা কোর্ব্বেন। ছোট ভাই বোলে—!" তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

সুপ্রকাশ তাঁহাকে বলিলেন, "আবার শীগ্‌গিরই দেখা হবে।" সুব্রত ম্লানমুখে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কানুর দীঘি।

(ভূমিকা)

এ দীঘি পটীয়া-থানার অন্তঃপাতী হাওলা-গ্রামের উপকণ্ঠে বাগচরা-মাঠের উত্তর-প্রান্তে অবস্থিত। প্রকৃতির বিলাস-ভূমি চট্টলার ইহা এক বিখ্যাত, বিশাল ও অতিপ্রাচীন দীঘি। ইহার আয়ু কত বৎসর তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। আমাদের এ বিস্তীর্ণ জনপদে "কানুর দীঘি"-নামেই ইহার সুপ্রকাশ। গ্রামের নবতিপরবয়ঃ প্রাপ্ত স্থবিরতম পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম—এক কৃষ্ণকানু ইহার জন্মদাতা। সন্দেহ-ভঞ্জন-মানসে কানুবংশীয়া বর্ষীয়সী এক ভদ্রমহিলাকে এ-সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলেন, তাঁহাদের বংশের জনৈক আদিপুরুষ পীতাম্বর কানু ইহা খনন করিয়াছেন। পীতাম্বর কানুই হউন, আর কৃষ্ণ কানুই হউন, সে কানু একটী বই দুইটী ছিলেন না; এবং ইহা কানুরই উপযুক্ত বটে। কালিন্দীর মতন ইহারও জল গাঢ় কৃষ্ণ। কালিন্দী হইতে নিমজ্জিত কৃষ্ণকে লইয়া যেমন ব্রজাঙ্গনাগণ পুলকে ব্রজে গিয়াছিলেন, তেমনি কানুর দীঘি হইতেও কৃষ্ণ সলিল লইয়া গৃহলক্ষ্মীগণ পরমানন্দে গৃহে যান। সময়ে সময়ে কালিন্দী-তীর কালার মোহন মুরলীতানে মুখরিত হইত; সময় সময় কানুর দীঘিও কালার প্রাণ-মাতান কুহুতানে ঝঙ্কৃত হয়। কালিন্দীর আশে পাশে ব্রজের মাঠে মাঠে যেমন গোপাল চরিত ও সঙ্গে সঙ্গে রাখাল বালকেরা বিহার করিত, তেমনি কানুর দীঘিরও পার্শ্বস্থিত মাঠে ঘাটে গোপাল চরে এবং তৎসঙ্গে রাখালকুল খেলে। সুতরাং **কানুর দীঘি** ইহার উপযুক্ত সংজ্ঞা, **কানুর দীঘি** ইহার উচিত নামকরণ।

কালের কোন্ তিমির-গর্ভে ইহার জনকদেব লুকাইয়াছেন, জানি না। মনে হয়, যতদিন তিনি ছিলেন, প্রাণপ্রতিমা দীর্ঘিকা-দুহিতা ততদিন তাঁহারই আদরে গরবিণী ছিলেন। কিন্তু আজ কালের কুটিল আবর্ত্তনে ইহার অনেক পতি হইয়াছে,—একাধিপতি কেহই নাই। অনেকের হইয়া সে কাহারও নয়!—সে আদৃতা নয়, সে পরিত্যক্তা। * * *

---

* ফতেয়াবাদ চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

শৈল-কিরীটিনী মম জন্মভূমি-অঙ্গে
মনোহর মরকত স্বচ্ছ আভরণ,—
শ্যামলা প্রকৃতি-অঙ্ক উদ্ভাসিত করি
কে তুমি, বিপুল যশ ঘোষিবারে কা'র
লভেছ জনম? লোকালয় কোলাহল
দূরে তেয়াগিয়া, বিজন প্রান্তরে আসি
রচিয়াছ শ্রী-নিবাস; পবিত্র আশ্রম
নির্ম্মায় তপস্বী যথা গহন কাননে!
তুঙ্গতীর-চতুষ্টয় পর্ব্বত-প্রমাণ
কত শত শতাব্দীর ঝটিকা হেলিয়া
এখনও গরবে তারা আছে সমুন্নত;
বিপদে যেমন শূর স্থির অচঞ্চল।
হরিতাভ শস্য-ক্ষেত্র চারিধারে তার
তুলিয়া রজত শির কাঁপিছে হিল্লোলে।
সন্নিকটে অদ্রিমালা আকাশের গায়
ঘনকৃষ্ণ অভ্র-নিভ আছে প্রতিভাত।
অপূর্ব্ব এ সমাবেশ!—সুরম্য বিপিনে
আরামের উপবন, বিশ্রামের স্থান,
কল্পনার লীলাভূমি হয়েছে সৃজিত।
চারি কোণে বনস্পতি আত্মজ তোমার
প্রসারি সহস্র শাখা ছায়া বিস্তারিয়া
করিতেছে আবাহন শ্রান্ত পথিকেরে;
অথবা প্রহরী-সম আছে দাঁড়াইয়া
দেখাইতে পর্য্যটকে বিচিত্র এ শোভা!
স্মরণ কি হয় সখি! সকাল বিকাল
কত নিশীথ প্রদোষ যাপিয়াছি আমি
তব সুন্দর বেলায় সাথী সনে? কত
ভুলিয়াছি দুঃখ ব্যথা, খুলিয়াছি হেথা
অন্তরের উপন্যাস? কতবার তুমি
উদাস আকুল চিত্ত বিনোদন হেতু
মৃদুল সমীরে ধীরে করেছ ব্যজন?
না, না, ভ্রান্তি মম! হেন পরিচর্য্যা তব
সকলের প্রতি! কত পান্থ আসে যায়
এই উপকূলে, জুড়ায় উত্তপ্ত প্রাণ
শীতল সলিল আকণ্ঠ করিয়া পান।
সুচারু এ ছবি হেরি কে না মুগ্ধ হয়?—
ক্ষুদ্র দীন মোর মত প্রণয়-ভিখারী
কতজন আছে! কে না ভজে তোমা?—দৃষ্টি
অসম্ভব তাঁর, নিরখি ভুলেন যিনি।
হীনজনস্থান নয় তব পুণ্য-স্মৃতি।
শরতের পূর্ণশশী জোছনা-ধারায়
সুষুপ্ত ধরণী-বক্ষ করিলে প্লাবিত
একদা আগ্রহে মোরা তিনবন্ধু মিলে
গিয়েছিনু তব কোলে বিরাম আশায়!—
মনে পড়ে সেই দিন—অন্তরীক্ষ হ'তে
উদার প্রশান্ত তব হৃদয়-দর্পণে
নেমেছিল নিশাপতি নক্ষত্র-আসনে।
হেসেছিলে তুমি কেমন মধুর হাসি
কৌমুদীর শুভ্রবাস করি পরিধান।
ওই শুভক্ষণে মোরা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
এ-পার ও-পার করি ঘুরি চারিচার,
করিলাম প্রদক্ষিণ শোভন প্রতিমা;
অনন্তর বসিলাম পশ্চিম তটেতে,
অতৃপ্ত লোচনে সবে করিলাম পান
নিশ্চল সৌন্দর্য্য-সুধা; বহুক্ষণ পরে
করিনু বন্দনা তাঁর মোহন সঙ্গীতে;
অন্তরে প্রণমি শেষ লইনু বিদায়।
করেছিলে লক্ষ দেবি! গুপ্ত হৃদয়ের
ভক্তি-প্রীতি-উপাসনা শর্ব্বরী-আলোকে?
সুনিশ্চিত—যদি জড়ে সম্ভবে চেতনা!
মৃন্ময় এ স্থূল দেহ মিশিলে ধূলায়,
যদি এই সুখ-স্মৃতি করিয়া ধারণ
উড়য়ে নির্ম্মুক্ত আত্মা অনন্ত গগনে,
বিহগের সাথে আমি তব তীরতরু
করিব আশ্রয়। দিবস-রজনী সদা
বাল্যতীর্থস্থান এই যমুনার তটে
বিহরিব সুখে, আর অর্চ্চনায় তব
মরত জীবন মম করিব সফল
অধোবাস যতদিন না হয় খণ্ডন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহা।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।